KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M T AMER LANE, KOLKATA-700009

Card No. KLMLGK 200	Place of Publication: ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৬
Collection: KLMLG	Publisher: অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
Title: সমকালীন (SAMAKALIN)	Size: 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number: ২৬/- ২৬/- ২৭/- ২৮/-	Year of Publication: সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ // Sep 1975 নভেম্বর ১৯৭৫ // Nov 1975 জুলাই ১৯৭৬ // July 1976 সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ // Sep 1976
	Condition: Brittle Good
Editor: অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	Remarks:

D Ro No.: KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিকপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

চতুর্বিংশ বর্ষ ॥ ভাদ্র ১৩৮৩

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন. কলকাতা-৭০০০০৯

আপনিই বন্ধ করতে পারেন এই অগ্নিকাণ্ড

যদি জ্বলন্ত দেশলাই-এর কাঠি বা সিগারেটে-এর টুকরো এখানে ওখানে না ফেলেন, যদি আপনার ব্যক্তিগত মালপত্রের সঙ্গে সহজদাহ্য জিনিষ, বিস্ফোরক বা এসিড ইত্যাদি না নেন এবং কামরার মধ্যে ষ্টোভ বা চুল্লী না জ্বালান।

আপনার ভ্রমণকে নিরাপদ করার জন্য আমাদের সাহায্য করুন

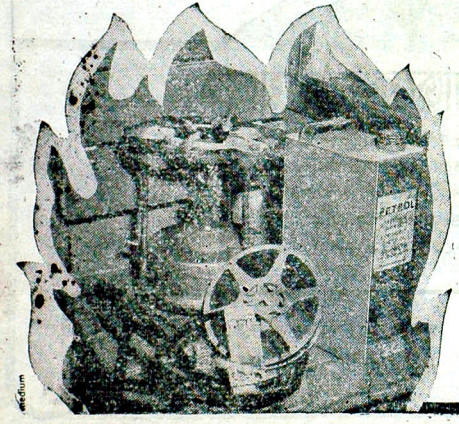

পূর্ব রেলওয়ে

চতুর্বিংশ বর্ষ ৫ম সংখ্যা ॥ ভাদ্র তেরশ' তিরাশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

বিয়ের সাহিত্য ॥ কনককান্তি বসু ১৮১

কালীঘাটের পট ॥ বিমলেন্দু চক্রবর্তী ১৯০

মন্ত্রচর্যা ও লৌকিক বিশ্বাস ॥ অজিতকুমার মিত্র ২০১

বৈদিক সূক্তিতে সমাজ প্রবাহ ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর ২০৫

আলোচনা : ভারত-ইরাণ ॥ মিহিরচন্দ্র মিত্র ২১১

সমালোচনা : জমিদার রবীন্দ্রনাথ ॥ পদ্মধর ভট্টাচার্য ২১৫

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক সুশীল প্রিন্টার্স ২ ঈশ্বর মিল বাই লেন, কলি-৬ হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলি-১৩হইতে প্রকাশিত

সোনা ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরির খেলা
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা।

শান্তিনিকেতন ... শরততর নির্মল আকাশ আর ধানক্ষেতে দোলা লাগানো মৃদুমন্দ বাতাসের স্পর্শ। এখানে ওখানে হাজারো গাছের আড়ালে নাম-না-জানা অজস্র পাখির ভীড়। সুরকি-ঢালা লাল রাস্তার পাশে পাশে গাছের ছায়ায় প্রাচীন তপোবনের ঐতিহ্য। একাধিক বিস্ময়কর মূর্তি...ভাস্কর্যের বিমুগ্ধ প্রতীক। উপরন্তু বিচিত্রা আর উদয়ন কবিগুরুর পূণ্য স্মৃতিধন্য। আম্রকুঞ্জ আর শালবীথিতে পথিকের ভীড়। আশ্রমের বাইরে মেঠো পথে রাখালিয়া বাঁশির সুর। এ সব নিয়েই আজকের শান্তিনিকেতন.. আপনার আমার 'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি'।

বুকিংএর জন্য যোগাযোগ করুন: রিজার্ভেশন কাউন্টার, ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, ৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ঈস্ট) কলিকাতা-৭০০০০১ অথবা ম্যানেজার, ট্যুরিস্ট লজ।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন:
ট্যুরিস্ট ব্যুরো ৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ঈস্ট) কলিকাতা-৭০০০০১
ফোন: ২৩-৮২৭১ গ্রাম: TRAVELTIPS
পর্যটন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

TCP/TR 2428/76

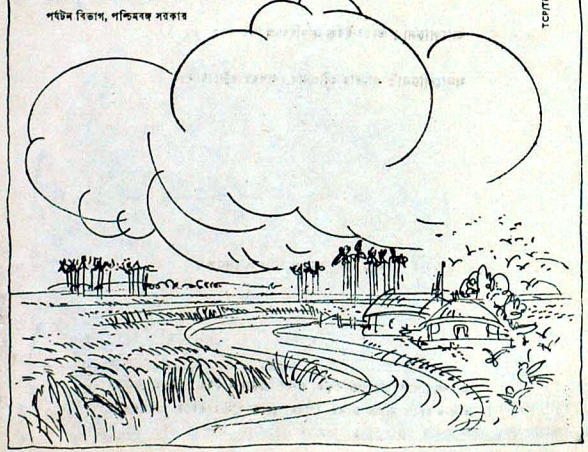

ভাদ্র তেরশ' তিরাশী | সমকালীন | চতুর্বিংশ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

বিয়ের সাহিত্য

কনককান্তি বসু

সংগ্রহটি হাতে নিয়ে বিস্মিত হতে হয়। ষাট বছরে বাংলাদেশে শহর, আধাশহর গ্রাম গঞ্জে অনুষ্ঠিত প্রায় হাজারখানেক বিয়ের সাহিত্যের সংগ্রহ এটি। সংগ্রাহক বছর পনেরো আগে 'বিয়ের পদ্য' নামে এক লঘু রচনা লিখেছিলেন। এই বিষয়ে কিছু গুরুগম্ভীর কাজ করার ইচ্ছে তাঁর ছিল, কিন্তু যে কোন কারণে হোক পেরে ওঠেন নি। বর্তমান আলোচক এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ উৎসাহ দেখানোর পর সমগ্র সংগ্রহটি তিনি হাতে তুলে দেন। বিয়ের সাহিত্যের এই নমুনাগুলিতে একটু নজর ফেললে যে সত্য ফুটে ওঠে তা থেকে বোঝা যায় এই বস্তু কেন চিরন্তন সাহিত্যের দরবারে ঠাঁই পেল না। আসলে বিয়ের সাহিত্যের লক্ষ্য শুধু বিয়ের রাত্রিটুকু, চিরন্তনতা নয়। আরেকটি ব্যাপার, বিয়ের সাহিত্য পূর্ণত হুকুমী সৃষ্টি, অনুরোধ আদেশ ইত্যাদি থেকে যে সৃষ্টিকর্মের জন্ম—এ সাহিত্য তারই স্বগোত্র। অর্থাৎ প্রচার বা বিজ্ঞাপন সাহিত্যের মত কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করা এর প্রাথমিক কর্তব্য। তবু বাংলার রথীমহারথী সাহিত্যিকরা কখনো প্রকাশ্যে কখনো পর্দার আড়াল থেকে এই হুকুমী সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। কবি নবীন সেন তাঁর ছেলের বিয়েতে 'বিবাহ মঙ্গল' নাটক লিখে বিলিয়েছেন, এমনকি বিয়ের আসরে 'শুভ নির্মাল্য' নাটকের অভিনয় পর্যন্ত করিয়েছিলেন। সেই অভিনয় এমনি আকর্ষণীয় হয়েছিল যে জনসাধারণের অনুরোধে পুনরাভিনয়ের বন্দোবস্ত তাঁকে করতে হয়েছিল। কবি অক্ষয়কুমার বড়াল সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের বিয়েতে লিখলেন:

তোমরা কে হে
লভিছ অমর সুখ এই ময় দেহে

নয়নে নয়নে হয়
কিবা প্রাণ বিনিময়
কি মধুর লীলা-ছলা সাধের সন্দেহে।

রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবীর বিবাহ উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখলেন, 'যৌতুক কি কৌতুক'।

ছদ্মবেশধারী উৎসর্গ
এক কথায়
উপসর্গ

শর্বরী গিয়াছে চলি, দ্বিজরাজ একা পড়ি
প্রতীক্ষিত পূর্ণ রবির উদয়
গন্ধহীন দুই চারি রজনীগন্ধা লয়ে তড়িঘড়ি
মালা এক গাঁথি অসময়,
সঁপিতে রবির শিরে এই আশীষিয়া তারে
আনন্দিতা স্বর্ণমৃণালিনী হোক
স্বর্ণ তুলির তব পুরস্কার। মন্দ্রজার কারে
যে পড়ে পড়ুক থাইয়া ঢোক।

নবীনচন্দ্রের সঙ্গে নাম মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন 'পরিণয় মঙ্গল',

'তোমাদের বিয়ে হল ফাগুনের চৌঠা,
অক্ষয় হয়ে থাক সিঁদুরের কৌটা
সাতচড়ে তবু যেন কথা মুখে না ফোটে
নাসিকার ডগা ছেড়ে ঘোমটাও না ওঠে
শাশুড়ি না বলে যেন কি বেহায়া বৌটা।'

রবীন্দ্রনাথের হাতে বিয়ের সাহিত্য কখনো কখনো ছড়ার মেজাজ ছাড়িয়ে কবিতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

যে তরণীখানি ভাসালে দুজনে আজি, হে নবীন সংসারী।
কাণ্ডারী কোরো তাঁহারে তাহার যিনি এ ভবের কাণ্ডারী॥
কাল পারাবার যিনি চিরদিন করিছেন পার বিরাম বিহীন
শুভ যাত্রায় আজি তিনি দিন প্রসাদ পবন সঞ্চারি॥

রবীন্দ্রকবির বিয়ের সাহিত্যের নমুনা অগণিত বলা যায়। রবীন্দ্রপরবর্তী যুগে যিনি নামাঙ্কিত বিয়ের সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তিনি হলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। অন্য প্রদেশের সঙ্গে বাঙালীর বৈবাহিক সম্পর্ককে স্মরণীয় করতে তিনি লিখে বসলেন :

এস মুকুটের মণি, দেশমুখ্য
রাজার দুহিতা

এস সাধ্বী। স্বয়ম্বরা, এস বঙ্গে
রাজশ্রী ইন্দিরা।
এস লাবণ্যের লতা, মনস্বিনী
গৌরবে গম্ভীরা
এস গো জয়শ্রী, এস ভূপ-জিতেন্দ্রের
প্রেম জিতা।
কেশবের আশীর্বাদ উদ্ভাসিতে
অয়ি শুচিস্মিতা,
ভবিষ্যৎ যাত্রাপথ, ব্রহ্মপুত্রে তাই পুণ্যনীরা
মিলিল নর্মদাধারা, ধ্যানে ধরি
দেখিল ধ্যানীরা
দেবতার এ ইঙ্গিত বঙ্গে
মারাঠায় কুটুম্বিতা।
স্বর্গে আজি কোলাকুলি গৌরাঙ্গেও
গুরু রামদাসে
চণ্ডীদাসে তুকারামে কীর্তিধামে
অপূর্ব মিতালী
বীরলোকে ছত্রপতি মর্যাদায়
প্রতাপে সম্ভাষে
বর্গীরা এনেছে অর্ঘ্য—সম্মানিত
সমস্ত বাঙ্গালী।

সম্প্রতিকালের সাহিত্যিকরাও এ ব্যাপারে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন নি। বনফুল মহাশয় হয়ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কখনো বিয়ের সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন।

ওই আসে বর ওই আসে বর
পড়িয়াছে সাড়া দূরেও কাছে
অনমিত আঁখি হিয়া থরথর
বধূ যে সাজিয়া বসিয়া আছে
তোমরা হয়ত জানো না কেউ
ফুলে ফুলে আজি লেগেছে নূতন রঙের ঢেউ
পাখীর কণ্ঠে জেগেছে আজিকে নূতন গান
তোমরা হয়ত জানো না কেউ
দেবলোকে আজি লেগেছে রসের নূতন ঢেউ।
স্বয়ং ব্রহ্মা চতুর্মুখেতে ধরেছে গান

নূতন করিয়া লক্ষ্মীর প্রেমে
পড়েছেন আজি শ্রীভগবান।
মহেশ পাগল হয়ে বিহ্বল
আবার উমার প্রসাদ যাচে
ওই আসে বর ওই আসে বর
পড়িয়াছে সাড়া দূরেও কাছে।
অথবা,
যে চিরন্তন মহাদেব
প্রচ্ছন্ন হয়ে আছেন
প্রতি পুরুষের মধ্যে
চলেছে তারই তপোভঙ্গের আয়োজন
বিশ্ব জুড়ে।
উদাসীনকে সংসারী করবার জন্য
দিগম্বরকে বর-বেশে সজ্জিত করবার প্রচেষ্টায়,
আকাশচারী বিহঙ্গকে
মায়াপিঞ্জরে বন্দী করবার আগ্রহে,
উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে
নিখিল বিশ্বের ছন্দ-গন্ধ-বর্ণ সঙ্গীত
উমাদের তপস্যা মহিমায়।

বিয়ের সাহিত্য মূলত ছন্দোবদ্ধে হলেও গদ্যকে মাধ্যম করে কিছু কিছু সৃষ্টিনমুনা হাজির হয়েছে। একটি স্মরণিকায় তিনটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া মিলন পত্রিকা, পরিণয় পত্রিকা, প্রজাপতির কথা জাতীয় কিছু কিছু সংবাদপত্রের ঢঙে তৈরী বিয়ের সাহিত্য রয়েছে। এগুলিতে বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর মত করে যা পরিবেশন করা হয় তাও বিয়ের সাহিত্যের অঙ্গ। যেমন, ঘটক এণ্ড কোংয়ের সুবিখ্যাত 'পরিণয় বটিকা' হৃদয়ের ক্ষতে অব্যর্থ ; সাতপাক প্রযোজিত 'ছাদনাতলা' মুক্তি অপেক্ষায় ইত্যাদি। আরেকটি পত্রিকার মূল্য লেখা হয়েছে মিষ্টি হাসি ও আশীর্বাদ। 'বিবাহ বিল লইয়া হট্টগোল' এই শিরোনামায় একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে : 'লোকে লোকারণ্য জমজমাট শূন্য এক সভায় কালবৈশাখীর ঝড়ের মত হঠাৎ বিবাহ বিল আলোচ্য হইয়া দাঁড়ায়। সভাপতি মহাশয় বিলটির বিপক্ষে যৎপরোনাস্তি বিষোদ্গার করেন। কিন্তু উত্তেজিত জনতা এই জনপ্রিয় বিলটি লইয়া এমন কাণ্ড বাঁধাইয়া তোলেন যে অতঃপর সভার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। হট্টরোলের মাঝে সভাপতির ক্ষীণকণ্ঠ শোনা যায়, আর সভাপতি নয়, সভা শেষ তাই শুধু পতি। সভার উদ্যোক্তা মিলন সমিতির সদস্য সদস্যারা কোরাস গলা দিলেন প্রজাপতি মাইকি জয়'। গদ্যে লেখা এই ধরণের লঘু রচনা ছাড়া বিয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাহিত্য বলতে আমরা বিয়ের পদ্যকেই বুঝি।

বিয়ের পদ্যে সরাসরি কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ নজরে আসে। প্রবীণ প্রবীণা অর্থাৎ পাত্রপাত্রীর গুরুজনদের নামে সে পদ্য পাওয়া যায় তাতে আশীর্বাদ ও নীতিবাক্য প্রধান অংশ নিয়ে থাকে। তাছাড়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, গৃহদেবতার কৃপাভিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে সনাতন সুর সৃষ্টি করা হয়।

নিত্য যেথায় আসন পেতেছে
চিত্ত করেছ জয়
প্রেমের বাঁধনে বেঁধে দিলে সেথা
প্রভু হে করুণাময়।
তোমারি করুণা করি গো কামনা
আজি এ শুভক্ষণে,
আশিস্ ঝরিয়া দাও গো ভরিয়া
এদের যুগল মনে।

কখনো কখনো আশীর্বচনী পদ্যের মধ্যে একটু বিষাদের প্রলেপ দিয়ে স্বর্গত আত্মজনদের স্মরণ করার প্রয়াস পাওয়া হয়।

সনাতন মর্মবাণী শুনিয়াছি
বলিতেছি তাই
সীতা সাবিত্রীর মত
তোমাকেও দেখিবারে চাই।
স্নেহ-প্রীতি-দয়ামায়া
শ্রদ্ধাপাত্রে শ্রদ্ধা আরোপণ
উদার আকাশ সম
দিগন্ত বিস্তৃত কর মন।
আজিকার মধুরাতে
প্রাণভরা আশীর্বাদ বিনা
কি দিব তোমাকে বল
আমি তো জানি না।
ঊর্ধ্ব হতে আছে জেনো
ঠাকুমার আশীষের ধারা
করপুট ভরি লয়ে
উজ্জ্বল অক্ষয় কর তারা॥

আর একটিতে বলা হচ্ছে,

জীবন সাগরে ঝড় ওঠে যদি
নাবিক পেয়ো না ভয়

ঠাকুমার কথা স্মরণীয় তথা
সংশয় কর জয়।

নীতিশিক্ষার বয়ান সাধারণত তিন-চার রকমের নজরে পড়ে :

১. স্বামীর চরণ-তরী ভরসা কেবল
স্বামীপদে পাবে মাগো চতুর্বর্গ ফল।

২. মাথায় সিঁদুর আর হাতে লোহা দিয়ে
চিরকাল কর ঘর পতিপুত্র নিয়ে।

৩. সীতা সাবিত্রী সমা সতী ধর্মে অনুপমা
স্বামীর বিপদে সাথে থেকে অনুক্ষণ।

৪। মা, তুই মোর হৃদয়ের ধন
চিরদিন তাই তোরে করেছি যতন।
শিবপূজা করেছিলে
মনোমত শিব পেলে
সেবিও, পূজিও তারে অমূল্য রতন

মাঝবয়সী দিদি-বউদি বা ঐ রকম সম্পর্কের নামাঙ্কিত 'কথঞ্চিৎ' 'যৎসামান্য' 'আনন্দ আজ' 'উচ্ছ্বাস' শিরোনামার পদ্য নীতি শিক্ষার সুর থেকে বিযুক্ত হয়ে কখনো কখনো লঘুচপল সুর ধরে। তত্ত্ব ও তথ্যের জগখিচুড়িতে এই সব পদ্য বিচিত্র বস্তুতে পরিণত হয়।

১. আকাশ মাটির মাঝখানে আজ
জ্যোৎস্নার উপবন
নিমাই আরতি আরতি নিমাই
দোঁহে হল বন্ধন।

২. এতদিন ছিলে তুমি বালিকা সদনে
আজি হতে প্রবেশিলে সংসার কাননে।

৩. শুনছি নাকি ও ঠাকুরপো আজকে তোমার বি. এ.
বৌ আনতে যাচ্ছ তুমি ফ্রেণ্ড ষ্টাফ নিয়ে
গুড় মিষ্টি, চিনি মিষ্টি আরও মিষ্টি হনি
সবার সেরা ওয়াইফ মিষ্টি জেনে রাখ তুমি॥

বান্ধব-বান্ধবী বা সমবয়সীদের পদ্যে আলাদা একটা পরিবেশ নজরে আসে। এগুলির মেজাজ প্রায়ই হাল্কা হয় এবং পাত্রপাত্রীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার তারতম্যে এই জাতীয় পদ্যের মেজাজেরও তারতম্য ঘটে।

১. দেখে শুনে সামলে চলিস
কিসের এত তাড়া?

ও বুঝেছি মনের ভিতর
কে দিয়েছে সাড়া।

২. আটকে তোকে রাখব না ভাই
রাখতে কি আর পারি?
শেষটা কেন আমার সঙ্গে
করবি তোরা আড়ি।

৩. শ্রাবণের মাঝে এক বার্তা শুনি আজ
তুই নাকি ভাই শাজাহানের হবি মমতাজ।

৪. আজ মধুমাস, নাচিছে ময়ূর আমার সখী যে
স্বপ্নে আতুর
কোন্ প্রজাপতি হেরি?
ছন্দে ছন্দে মধুর মন্ত্রে
'আর হবে না দেরী।'

বিয়ের পদ্য ব্যাপারে সবচাইতে উৎসাহ যাদের বেশী সেই ছোটদের নামের লেখায় সাধারণত ছড়ার ছন্দকে আশ্রয় করা হয় বিয়ের ধূমধামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এগুলি অতিশয় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে :

১. আজকে পিসীর বিয়েতে ভাই
ক্যায়সা মজার দিন
পেঁদিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেব
আয়না ব্যাটা চীন।

২. শিকেয় তুলে বিয়ের পদ্য, লুচি মণ্ডা খাই
ছোট পিসীর বিয়ে যে আজ অন্য কথা নাই।

৩. রাঙা কাকার বিয়ে,
সবাই মিলে বসে গেছি কাগজ কলম নিয়ে,
বিড় বিড় বিড় বকছি মনে মিল্‌টি কেবল খুঁজি
মিলের মত মিল পেলে ভাই আনন্দে চোখ বুজি।

৪. সকলের মুখে শুনি বৌদি যে আস্‌ছে
ভোর থেকে গোটা বাড়ী তাই দেখ হাসছে।

বিয়ের পদ্যে পরী, কলাগাছ এবং অলংকৃত লতাপাতার মধ্যে কয়েকটি মামুলি ছত্র প্রায় সর্বত্র নজরে পড়ে। তবে শহরাঞ্চলের চাইতে আধা-শহর বা গ্রামের দিকেই এগুলির প্রতি বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়।

১। জীবনের পার হতে অটুট সম্বন্ধ ভরা
কেন এই লোকাচার কেন শুভদৃষ্টি করা।

২. দুজনে মিলিয়া গৃহের প্রদীপে
জ্বালাইছে যে আলোক
তাহাতে হে দেব হে বিশ্বদেব
তোমার আরতি হোক।

৩. অসীম মিশিতে চায় অসীমের কোলে
তটিনী মিশিতে চায় সাগর কল্লোলে

৪. দুইটি নবীন বুকে চির আলিঙ্গন
দুইটি অধীর প্রাণে প্রেম পরশন
দুইটি অধরে এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসর শয়ন

কয়েকশো বিয়ের পদ্যে এমন কিছু মিল দেখা গেছে যা থেকে অনুমান করা যায় যে প্রেসে ওই ধরণের কিছু পদ্য মজুত রাখা থাকে। পাত্র-পাত্রীর নামধাম এবং আরো কিছু খুটিনাটি জায়গামত বসিয়ে পুরনো বয়ান নতুন রূপ নেয়। দুটি পদ্যের শেষে প্রেস লাইনে বিজ্ঞাপন রয়েছে…এখানে বিয়ের পদ্য রচনার লোক আছে। ফি মুদ্রণ হইতে স্বতন্ত্র। (!) আর একটি পদ্যের শেষে দেখা যাচ্ছে: রচক ও মুদ্রক…যন্ত্র প্রেস। এই পদ্যটির বাঁধনে প্রাচীন বাংলা প্রহেলিকা ঢঙ অনুসরণ করা হচ্ছে।

তেরশো তিপ্পান্ন সালের সালের বৈশাখ মাসে
চাঁদের শোভা পূর্ণিমা তৃতীয় দিবসে
রাত্রির দ্বিতীয় ভাগে ধনু মকর কুম্ভ যোগে
মিলাইব দুটি প্রাণ অতি সযতনে
দয়াময় দিও স্থান ও রাঙা চরণে॥

একটি অসাধারণ বিয়ের পদ্য নজরে পড়ল। ঘটনাটি গোন্দলপাড়া, চন্দননগরে ১৩৩৭ ৩রা বৈশাখ ঘটেছিল। বিয়ের পদ্যের এই সংগ্রহে এমন পদ্য আর দ্বিতীয়টি দেখা যায়নি। পিতার দ্বিতীয়পক্ষের বিবাহ উপলক্ষে পুত্রের নামাঙ্কিত বিয়ের পদ্যের নমুনা এটি। আমরা এই পদ্যটি হুবহু উদ্ধার করে বর্তমান প্রস্তাবনার উপসংহার টানলাম।

'পড়ুন নালো চড়ুন
ব্যাঙে চিড়া খায়
বাপের বিয়া না হইতে
মায় শ্বশুরবাড়ি যায়॥'

বাবা-কে

আজি বৈশাখে দোলে সাথে সাথে
দোলচাঁপার ফুল

তারি সাথে সাথে ফোটে আজি বাবা
তোমার বিয়ের ফুল।
এ শুভ লগনে মায়েরে হারায়ে লাগিতেছে সব ফাঁকা
কোথা তুমি বাবা কোথা নতুন-মা রাখিব দুঃখ ঢাকা।

নতুন মা-কে

মাগো পড়ি নাই কাব্য ব্যাকরণ
নাহি ভাব নাহি ভাষা তবু প্রাণে জাগে আশা
দুকথা লিখিব আজ মনের মতন।
মাতঃ, ভাষা দাও ভাষা দাও মোরে
প্রীতি উপহার রচিবার তরে
উদয় হওগো মাতঃ মানস মন্দিরে
তব পদে এই নিবেদন॥

কালীঘাটের পট

বিমলেন্দু চক্রবর্তী

দীঘল পট—মানব সংসারে এক কল্পনার জগৎ। একাধিক চরিত্র ও কাহিনী নিয়ে গড়ে ওঠে দীঘল পটের পৃথিবী। গাছ, মানুষ, জীব-জগৎ পটের প্রেক্ষাপটের এক সুরে বাঁধা পড়ে। প্রতিটি দৃশ্য এক শৃঙ্খলা পদ্ধতির শাসনে গ্রথিত হয়ে নাটকীয়তা আনে।

কালীঘাটের পট বিচ্ছিন্ন ছবির জগৎ। ছোট এক চৌমুণীতেই তার সম্পূর্ণতা নিয়ে কালীঘাটের পট আকস্মিক উদ্দীপনায় বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে প্রজ্জলিত হয়ে উঠেছিল কালীঘাটের আঙ্গিনায়। বাঙলার লোকায়ত চিত্র বিশেষ চরিত্র অর্জন করে যেন মণিময় দীপ্তি লাভ করেছিল। যদিও পটের এই অভূতপূর্ব তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারিনি। পটের অভিনব স্রষ্টারা জীবিত অবস্থায় 'পটো' নামে এক অবহেলিত জীবন যাপন করে কালের স্রোতে লুপ্ত হয়ে গেছে। তাদের অবলুপ্তি এবং পটধারার সমাপ্তিলগ্নে পট সম্পর্কে সচেতনতা জাগে।

ফলে কালীঘাটের পট নিয়ে কিছু ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই কালীঘাটের পট আর দীঘল পটের পার্থক্য বুঝতে পারেন না। কালীঘাটের পট বাঙলার চিরায়ত লোকচিত্রের বংশধর হয়েও স্বভাবে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। তার সাবলীল প্রাণময় রেখা এবং প্লাস্টিক নিটোলতা সম্পদ। দীঘল পট বাঙালীর আঙ্গিনায় মানস কল্পনার ছায়ার জগৎ। কালীঘাটের পট তেমনি বাঙালীর পুতুল এবং প্রতিমার কায়ার জগৎ। এই তার ব্যতিক্রম। আদি উৎস তার নিহিত আছে চৌকো পটের সবল ধারায়।

দীঘল পটের মত চৌকো পটের সূচনা কোন অতীতে তা বলা যাবে না। তবে বিভিন্ন লক্ষণ তাকে প্রাচীনতার গৌরব দান করে। মহেনজোদরোতে প্রাপ্ত সীলমোহর গুলিই আদি উৎস এ কথা বলতে প্রলুব্ধ করে। কারণ চৌকো পটের সমধর্মিতা মহেনজোদরোর সীলমোহর এবং পাহাড়পুরের ভাস্কর্যে দেখতে পাওয়া যায়। স্বভাব, বিষয় বস্তুর বিন্যাস প্রায় এক রকম।

পট এক সময় সমাজে ব্যাপক প্রসার-লাভ করেছিল। তাতে সন্দেহ নেই। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের কাব্য হরিবংশে চৌকো পটের উপস্থিতি দেখি। প্রাগ জ্যোতিষপুরের বাণ রাজার কন্যা উষা স্বপ্নে দেখা রাজপুত্রের প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়ে। স্বপ্নে দেখা রাজপুত্রকে সনাক্ত করার জন্য রাজপুত্রদের পট তৈরী করা হয়। এই পটের ভিতর থেকেই উষা খুঁজে পেয়েছিল তার স্বপ্নে দেখা রাজপুত্র কামদেবের পুত্র অনিরুদ্ধকে। বাংলার পল্লীগীতি এবং পদাবলী সাহিত্যেও পটের প্রচুর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। পট দেখিয়ে অনুরাগ সঞ্চার করা যেন এক রীতিতে পরিণত হয়েছিল। এ ছাড়া নায়িকারা বিরহকালে নায়কের চিত্র ভূমিতে আঁকবার চেষ্টা করছে এমন কবি-কল্পনার ও অভাব নেই।

এছাড়া সরা চৌকো পটের নামান্তর মাত্র। ঘটে পটে পূজার রীতিতো অত্যন্ত প্রাচীন রীতি। পাহাড়পুরের দেওয়াল ভাস্কর্যে চৌকো পটের ইসারা আছে তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এসব লক্ষণ এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করে যে, চৌকো পট বাঙালী চিত্রকররা বংশপরম্পরায় এঁকে এসেছে।

কালীঘাটেই চৌকো পটের সূচনা এধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। কালীঘাটের পট প্রচলিত ধারার পথ ধরে কালীঘাটে আত্মপ্রকাশ করে সামান্য ব্যতিক্রম নিয়ে। বাজার হাতের কাছে পেয়ে প্রয়োজনের তাগিদে তাকে এক বিশেষ রূপে সজ্জিত করে তোলে।

কালীঘাটের পট বংশপরম্পরার যে ধারা লোক-চিত্রে আছে তার বৈধ উত্তরাধিকারী। কালের স্রোতে সময়ের পরিবর্তনে দ্রুততর সৃষ্টির তাগিদে পটের দেহ পটে পরিবর্তনের সূচনা আনে। নতুন আঙ্গিক ও বিন্যাস আবিষ্কৃত হয়। রংয়ের তাৎপর্য পরিবর্তিত হয়ে যায়।

দীঘল পটে বিবাদী রং জোরে ধাক্কা দিয়ে ছবির বিষয়কে স্পষ্ট করে তোলে। তার ফলে পটের রং উজ্জল এবং বিপরীতমুখী তার ব্যবহার। রেখা শুধু আপাত বিরোধী রং ঘিরে ধরে রাখে। সরা চিত্রও তাই। কড়ির মত সাদা রঙের পটভূমিকায় উজ্জল রং বিপরীত আবর্ত সৃষ্টি করে। রেখায় ঘেরা রংকে তীব্র হতে সাহায্য করে। কালীঘাটের পটের রেখা প্রকাশ পেল সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্র নিয়ে। দ্রুততর সৃষ্টির তাগিদে রেখাই পেল প্রাধান্য। তার ফলে রেখা বাক চতুর হয়ে পটুয়ার হাতে সৃষ্টি করলো আলাদা এক তাৎপর্য। বাংলার লোকচিত্রের জগতে আনলো নতুনতর এক বিন্যাস। তাই বলে কালীঘাটের পট লোকচিত্র নয়, তা নয়।

এই নতুন বিন্যাস থাকার ফলেই অনেকে উৎসাহিত হ'লেন কালীঘাটের পটে বিদেশী গন্ধ অনুসন্ধানে। এ হল কালীঘাটের পট সম্পর্কে আর এক ভ্রান্তি। ভেবে অবাক হ'তে হয় এমন অবাস্তব ধারণার পল্লবগ্রাহীতা দেখে। যে সব যুক্তি বিদেশী প্রভাব প্রতিপন্ন করার জন্য ব্যবহার করা হয় তার অনেকটাই অবাস্তব। কালীঘাটে যখন পট আঁকা শুরু হয় তখন বেশ কিছু বিদেশী শিল্পী ছিলেন বাঙলা দেশে এতো সত্য কথা। তখন বিদেশ থেকে চিত্রকররা আসতেন অর্থ উপার্জনের আশায়। স্বভাবতই তাঁদের যোগাযোগ সমাজের বিত্তবানদের সঙ্গে। বিদেশী শিল্পীরা বাঁধা থাকতেন অভিজাত মহলে। পটুয়ারা ছিল দরিদ্র শিল্পী। তাদের কোন সুযোগ ছিল না এইসব প্রাসাদোপম বাড়ীগুলির মধ্যে ঢোকার।

অনেকের মতে কালীঘাটের গঙ্গার পাড়ে বিদেশীদের ছবি আঁকতে দূর থেকে দেখতেন পটুয়ারা। তাতেই তারা খানিকটা প্রভাবিত হয়ে পড়ল। শিল্প আলোচনায় এমন অবৈজ্ঞানিক উক্তি যে কি ভাবে উচ্চারিত হয় তা বাস্তবিকই রহস্য। বিদেশীরা বাস্তবাশ্রয় ছবির জগতের লোক। তাদের অঙ্কন মাধ্যম তেল রং। তেল রং দিয়ে যে ছবি আঁকা যায় তা যে ভেষজ রং দিয়ে করা সম্ভব নয় এটুকু বোধ কি পটুয়াদের থাকার নয়! পাশ্চাত্য চিত্রবিদ্যা বহু আয়াসে লব্ধ। দূর থেকে দেখার অভিজ্ঞতা দিয়ে তা আহরণ করা এক অবাস্তব কল্পনা। সব থেকে বড় কথা পাশ্চাত্যের চিত্রশিল্পের ধারা শুধু লোকায়ত নয় ভারতীয় শিল্পধারার বিপরীত। যারা স্বভাবজাত শিল্পী, বংশপরম্পরায় একই ধারা রক্ষায় আগ্রহী তারা সহজে এমন কোন ধারার প্রতি আকৃষ্ট হয় না যা তার আত্মবিকাশের সহজ সরল পন্থার বিরোধী। তাই বলে লোক শিল্পীর অভিজ্ঞতায় অন্যের প্রভাব আসে না তা নয়। বস্তুত নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সে আপন ধারার সঙ্গে মিলিয়ে নেয় যে ধারা তার সঙ্গতি ও সরলতাকে উন্নত করে এবং সর্বব্যাপক আবেদন সৃষ্টিতে সাহায্য করে। বিজাতীয় কোন ধ্যান ধারণা যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের সর্বনিম্নস্তর পর্যন্ত আলোড়িত না করতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত লোকশিল্পী সহজ উদাসীনতা

শোষণ করে। তাদের এই আত্মশক্তি আছে বলেই লোকশিল্পে বেনোজল ঢুকবার সুযোগ পায় না। বংশপরম্পরা ধরে একই ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলে।

নয়তো পাশ্চাত্য চিত্রকর এদেশে আসার আগেই বাঙলার লোক শিল্পীরা সান্নিধ্যলাভ করেছিল জয়পুরী চিত্ররীতির। মানসিংহের হাত ধরে ষোড়শ শতকের শেষদিকে এই প্রাণহীন ধারা বাঙলাদেশে ঢুকবার সুযোগ পায়। বাঙলার চিত্রকর প্রাণের তাগিদে জয়পুরের মিশ্রধারার কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। অভিজাত সমাজ-কর্তাদের চাপে জয়পুরী চিত্র তারা অনুকরণ করেছে। কিন্তু তাই বলে তাদের আপন লোকায়ত চিত্রধারাকে তারা অবহেলা করেনি। তার একটাই কারণ জয়পুরী ধারার প্রাণহীনতা, রাজকীয় জৌলুস লোকায়ত চিত্রশিল্পীর চোখ ঝলসাতে পারলেও প্রাণ ভরাতে পারেনি।

পাশ্চাত্যের চিত্রকলা বর্ণনির্ভর। আলোছায়ার বিজ্ঞানসম্মত বণ্টন তার। আর কালীঘাটের পট হল রেখানির্ভর। রং রেখার আশ্রয়ে প্রাণ পায়। সুতরাং এমন এক চিত্রধারায় পাশ্চাত্য-শিল্প আঙ্গিক ব্যবহার করতে যাওয়া নেহাতই পণ্ডশ্রম নয়, অসম্ভব। বস্তুত পাশ্চাত্য আঙ্গিক ব্যবহারের কোন সুযোগই নেই। ভেজন রং দিয়ে তা করাও যায় না। কালীঘাটের পটের গতিশীল রেখা এবং চোখ ও গালের পাশে সেডিংএর চেষ্টা পাশ্চাত্য প্রভাব অনুসন্ধানে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে। তারা ভুলে যান পটুয়ারা জাতে হিন্দু। তারা যেমন পটুয়া তেমনি পুতুল এবং প্রতিমা শিল্পী। কালীঘাটের পটকে অধিকতর জনপ্রিয় করার তাগিদ থেকে সেডিংয়ের আবির্ভাব। এ সেডিং একেবারেই প্রতিমার সুডোলত্ব সৃষ্টির তাগিদ থেকে। বস্তুত পটে সুডোলত্ব আনার প্রয়াস এই প্রথম। তাই বলে বিদেশী প্রভাবজাত একথা বলার কোন কারণ নেই।

কালীঘাটের পট নির্ভেজাল লোক-শিল্প। বংশ পরম্পরায় প্রচলিত লোকচিত্র ধারায় নব আঙ্গিক বিন্যাস কোন এক প্রতিভাধর পটুয়ার হাত থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল। তা সম্ভব হয়েছে দ্রুততর সৃষ্টির তাগিদ থেকে। অন্যান্য শিল্পীরা তা অনুকরণ করে এক বিশেষ শিল্পরীতি প্রতিষ্ঠিত করে। লক্ষণীয় সাহেবদের কোট, পাৎলুন, মাথার হাট এসব পটুয়ারা এঁকে তুলেছেন বাঙালী রীতিতে। লোকচিত্রে বস্তুর ওজন ধারণের যে প্রশ্ন প্রচলিত রীতি অনুযায়ী অস্বীকৃত।

কালীঘাটের পটের ধারা অব্যাহত গতিতে চলেছে যৌথ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। একটি পটের মধ্য দিয়ে। একটি পটের মধ্যে মিলে আছে একাধিক শিল্পীর কাজ। সাধারণত পুরুষরা কালো কালিতে দ্রুত হাতে তুলি টেনে প্রাথমিক ছকটি এঁকে দিত। তারফলে রেখায় এসেছে প্রতিমার সুডোল ভাব। মেয়েরা শূন্য স্থানগুলো রং দিয়ে ভরাট করতো। এক-একজন এক এক রং লাগাতো। এমনি করে একাধিক হাতের সহযোগিতার পথে একটি পট তৈরী হত। তার ফলে স্বল্প সময়ে প্রচুর পট তৈরী করা সম্ভব হত। পটুয়াদের আপন অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে এটা ছিল খুবই দরকারী। পটের ক্রেতা দরিদ্র জনসাধারণ। তাই বিনিময় মূল্য নামমাত্র রেখে পটুয়াকে বাজার রাখতে হত।

কালীঘাটের পটের এই যৌথ প্রয়াস বিশেষ লক্ষণীয় দিক। প্রথমে লাল রং দিয়ে আউট লাইন একে তার পরে রং দিয়ে ভড়াট করে তোলা হত। তারপর আবার রেখার ঘের দিয়ে রংকে বন্ধনীতে বাঁধা হত। তার ফলে পটে ঘিমাত্রা এবং নিটোলহীনতা আসতো অপরিহার্য রূপে। কালীঘাটের পটের ক্ষেত্রে অঙ্কন কৌশল গেল পাল্‌টে। প্রথমে এল প্রাণময় গতিশীল রেখা। পরে

শূন্যস্থান পূরণ করতে এল রং। প্রথম টানা রেখাই হল চূড়ান্ত রেখা। তার ফলে প্রথমবার টানা রেখাতেই জোড় পড়লো বেশি। অপরিহার্য ভাবে পটের রেখা উদ্দাম গতিতে যেন পটের দেহপটে বিচিত্র লীলায় আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পেল। বিক্রয়ের তাগিদ থেকে অনেক পটে রং-কেই অস্বীকার করা হল। লক্ষণীয় রং-হীন পটের রেখাই লীলাময়তা এবং প্রাণ প্রবাহে সৃষ্টির দক্ষতায় অসামান্যতার স্বাক্ষর ধরা পড়েছে।

কালীঘাটের পটের রেখায় আমরা দেখি রেখাশিল্পের এক চূড়ান্ত পর্যায় উত্তরণ। সামান্য কালির রেখা ওস্তাদ শিল্পীর হাতে কিরকম মুখরতা সৃষ্টি করতে পারে তার আশ্চর্য সব দৃষ্টান্ত। দ্রুতগামী রেখা আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে মসৃণ গতিতে গড়িয়ে চলে। রেখায় কোথাও ক্ষণিকের দুর্বলতার মালিন্য নেই। অব্যর্থ রেখা দ্রুত গতিতে বিষয়বস্তুকে রূপায়িত করে তুলেছে। রেখার প্রয়োজন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার বিরাম হীন অব্যাহত গতি। দীর্ঘ গতিময় রেখার সরু বা মোটা হয়ে যাবার প্রবণতা আশ্চর্য দক্ষতায় সংহত।

এ রেখার বড় গুণ রেখাই বস্তুর চরিত্রের প্রতিফলন ঘটায়। রেখা টানার গতিময়তার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় পুরুষের পেশল বহুল দেহের শক্তি। সেই রেখাই কি এক আশ্চর্য মায়ার সৃষ্টি করে নারীর সুকোমল লক্ষ্মীশ্রী। বাঙালী নারীর দেহাবয়বে যে কোমলতার প্রলেপ পটুয়ার গতিশীল রেখার তা প্রাণ লাভ করেছে। তুলির সামান্য ভঙ্গির পরিবর্তন করেই পটুয়া এমন আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছে।

এমন বেগবান গতিশীল রেখা যে কালীঘাটের পটুয়ার হাতেই প্রথম তা নয়। রেখা ব্যবহারের ঐতিহ্য বাঙালীর প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। শিল্পীরা কতখানি অজন্তার কাছে ঋণী তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। বাঙলার প্রাচীন যে শিল্প নিদর্শন আছে তা বিশ্লেষণ করলে রেখার আদি উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে। খৃষ্ট পূর্ব পনেরো শতক আগের পাণ্ডুরাজার ঢিবির স্মারকে ধরা আছে ময়ূরের এক বিচিত্র গ্রীবা ভঙ্গী। তার রেখায় অনভ্যাসের কোন জড়তা নেই। বরং রেখার সাবলীল গতিময়তা আছে বলে স্বীকার করতে উৎসাহ জাগে। সুন্দরবন ও চট্টগ্রামে প্রাপ্ত তাম্র পট দুটির উল্লেখ করা যেতে পারে। দৃষ্টান্ত দুটিই ত্রয়োদশ শতকের। তাম্রপটের ছবিতে রেখার যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তাতে তাদের কালীঘাটের পটের অগ্রগামীদল একথা অস্বীকার করা যায় না।

তাম্রপট দুটির রেখার ভাষা ব্যাখা করতে গিয়ে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, 'উভয় চিত্রের তীক্ষ্ণ রেখার দ্রুত রূপায়ণ এবং সে রূপায়নে সজীব প্রবাহমানতা অব্যাহত; অবিচ্ছিন্ন গতি ও অক্ষুণ্ণ।' দৃষ্টান্ত দুটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রেখাকে লীলায়িত করে দেবার প্রবণতা শিল্পীর ছিল। তামার পাতের অন্তরায়কে শিল্পী আপন দক্ষতায় অতিক্রম করতে চেয়েছেন। তার অভ্যাস এবং বিষয়ের প্রতি একাত্মতা তার রেখাকে বিলাস-ভঙ্গীর দিকে আমন্ত্রণ করেছে।

সরা এবং পটচিত্রে রেখার শূন্য স্থানকে রং দিয়ে ভরাট করলেও রেখার প্রধান ভূমিকা অস্বীকার করার নয়। আল্পনা আঁকা তো একেবারেই রেখানির্ভর। এমনকি তখন শিল্পীরা পর্যন্ত তাদের ভাস্কর্যে রেখার বিন্যাসকে অস্বীকার করতে পারে নি। মন্দিরের অঙ্গসজ্জার টেরাকোটা ফলকগুলিতেও রেখার প্রাধান্য। রেখার সাবলীলতা এবং রেখা নির্ভরতা বাঙালীর লোকশিল্পের

প্রাণ-পুরুষ একথা বলা যায়।

বাস্তবিক রেখার বক্রতা এবং দীর্ঘ সবল রেখার সংবেদনশীলতা লোকশিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমের মাধ্যমে চলে আসছিল। তাই তার রেখার বৈশিষ্ট্য চির কালের মত লুপ্ত হয়ে যেতে পারে নি। তাই এই সাবলীল রেখার পুনরুদ্ধাবিত রূপ দেখতে পাওয়া যায় উনবিংশ শতাব্দীর কেন্দুলী ও বনকাপাশীর পেতলের রথের গায়ে খোদিত চিত্রমালায়। সবল অর্থবহ সংবেদনশীল রেখার ব্যবহার স্পষ্ট। সুতরাং কালীঘাটের পটুয়ারাই শুধু গতিময় রেখার অধিকারী তা নয়, এরেখা বাঙালীর চিরায়ত সম্পদ।

কালীঘাটের মন্দিরের সূচনা হয় ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে। মন্দিরের নাম দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই ভক্তসমাগম শুরু হয়ে যায়। গড়ে ওঠে নব জনপদ। ভক্তের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে কালীঘাটের গুরুত্ব। নানা জীবিকার লোক এসে বসতি গড়তে থাকে। পটুয়ারাও এসে পড়েন।

পটুয়ারা গ্রাম বাংলার লোক। তাদের এমনি নগরে এসে অবস্থান গেড়ে বসা অস্বাভাবিক মনে হবার কোন কারণ নেই। ভক্তরা দেব স্থান থেকে ফিরে যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যান দেবস্থানের স্মৃতি। ভক্তরা দেবমূর্তি, ছোটদের জন্য খেলনা এসব সংগ্রহ করে থাকেন। বাঙলার এরীতি আজো অব্যাহত আছে। প্রতিটি খ্যাত মন্দিরের পাশেই পাওয়া যাবে লোক শিল্পের এবং খেলনার নানা বিপণি। কালীঘাটের পটুয়াদের আবির্ভাব ভক্তদের হাতে পটের যোগান দেবার তাগিদ থেকে। আরো একটা তাগিদ ছিল পটুয়াদের। তা হ'ল অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের তাগিদ।

বাঙলার পটুয়ারা যে শুধু পট আঁকতেন এমন কথা ভাবার সুযোগ নেই। বাঙলার ঐতিহ্য অনুযায়ী একাধিক শিল্পকর্মে তাদের হাত দিতে হ'ত। তার সঙ্গে ছিল কিছু কিছু কৃষি কাজ। অনগ্রসর সমাজের শিল্পীকে এমনি করেই বাঁচতে হয়। লোক শিল্পের যারা পৃষ্ঠপোষক তারাও অনগ্রসর সমাজের সাধারণ বৃত্তি ভোগী মানুষ। মোগল শাসনের অন্তিম দশায়, ব্রিটিশ শাসনের সূচনায় দুর্নিবার দুর্বিপাক নেমে এসেছিল বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনে। কৃষি জীবিরা যেমন ক্ষেত মজুরে পরিণত হয়েছে তেমনি গ্রামীণ অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল অব্যবস্থাও লাগামহীন শোষণে। মানুষ শোষণের যাঁতাকলে সর্বস্ব হারিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। এমনি এক পরিবেশের পরিস্থিতিতে পটুয়াদের পক্ষে জীবিকা নির্বাহ যে দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। স্বভাবতই জীবিকাচ্যুত মানুষের মতো তারা নগর জীবনের দিকে ধাবিত হয়। কালীঘাটের আঙ্গিনায় বাজার গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখে বসে যায়।

এটা অনুমান করা যায় নগর কেন্দ্রে একটা চালু বাজার পেয়ে অনেক পটুয়া গ্রামের ক্ষয়িষ্ণু দরিদ্র অসহায় জীবনের বন্ধন ছেড়ে চলে এসেছিল কোলকাতায়। এদের ভিতর যেমন ছিল পশ্চিম বাঙলার পটুয়ারা তেমনি কোন কোন পটুয়া যে পূর্ববাঙলা থেকেও এসেছিল তা অনুমান করা যায়।

লক্ষণীয় এটাই যে, এই সব পটুয়ারা কোন উঁচুবংশ জাত নয়। বটকৃষ্ণ পাল, পরাণ দাস, বলাই বৈরাগী প্রভৃতি নাম তাদের বংশ-পরিচয় প্রকাশ করছে। তবে কালীঘাটকে কেন্দ্রকরে বাঙলার পটুয়াদের একটা নতুন সমাজ গড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল। বিভিন্ন এলাকার পটুয়া এক কেন্দ্রে মিলিত হবার ফলে অভিজ্ঞতার বিনিময় ঘটে, পারস্পরিক বিনিময়ের পথ ধরে কালীঘাটের

চারিত্র অর্জন করে। বাস্তবিক কোন অঞ্চলের শিল্পীর কতটুকু দান তা আর নির্ণয় করার উপায় কালের গর্ভ বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কালীঘাটে যে সব পটুয়ারা এল তারা যে হিন্দু তা আর উল্লেখের দরকার পড়ে না। কালীমন্দিরকে কেন্দ্র করে পটের যে বাজার গড়ে উঠেছিল মুসলমান পটুয়াদের সেখানে আশ্রয় নেবার কোন উপায় ছিল না। সামাজিক কারণে হিন্দু পটুয়ারাই বাজার ব্যাপ্তির সুযোগ পেয়েছিল।

এসব পটুয়ারা ছিলেন সূত্রধর এবং প্রতিমা নির্মাণ শিল্পী। তার ফল হয়েছিল সুদূর প্রসারী। যারা কালীঘাটের পটে বিদেশী প্রভাব খুঁজে বেড়ান তারা এটা তলিয়ে দেখেন নি। বস্তুত সূত্রধর এবং প্রতিমা শিল্পীর হাতে রেখা যদি দ্রুত ধাবিত হয় তা হলে রেখা এবং চিত্রের যে পরিণতি ঘটতে পারে কালীঘাটের পটে ঠিক তাই হয়েছে। অন্যথা হবার উপায় নাই।

এই সূত্রধর পটুয়ার হাত থেকেই কিউবিইজিম আত্মপ্রকাশ করেছিল এটা অজানা তথ্য নয়। গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের সংগ্রহে এরকম পট আছে। পটগুলো যখন আঁকা হয়েছিল তখন ইউরোপেও এমন কিউবিইজমের সৃষ্টি হয় নি। কাঠের কাজের কাপড়ের ভাঁজই এরকম রেখার উৎস।

কালীঘাটের পট হল দেহবাদী বাঙালীর কায়া সাধনা। সীমাকে অসীম, ভাণ্ডকে ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মলীলায় বুঝবার যে সাধনা করে এসেছে তার এক নবরূপ। লোকচিত্রকর বলে এরা কায়ার সাধনা করতে গিয়ে মানুষকে নকল করতে বসেনি। কালীঘাটের পটের দেহলীলা একেবারেই প্রতিমার জগত। পশুপাখীরা পুতুলের জগৎ থেকে উঠে এসেছে। এগুলো মানুষের অবয়ব নয়। পুতুলের নয়তো মাটির প্রতিমার অবয়ব। এর জন্যই কালীঘাটে পটুয়ারা হাত পায়ের আঙ্গুল আঁকায় এত অমনোযোগী। মাটির প্রতিমার আঙ্গুল জোড়ার আগের পর্যায়ে পটের হাত পা বাঁধা পড়ে আছে। তালপাতার পুঁথির কৌনিক রেখার প্রতিফলন যেমন দেখতে পাওয়া যায় মন্দিরের টেরাকোটায় তেমনি ধাতু ঢালাইয়ের অভিজ্ঞতা মিলেছে বাঙালীর প্রতিমা শিল্পে। কালীঘাটের পট গড়ে উঠেছে প্রতিমা আর লোকায়ত পুতুলের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে।

লোকায়ত শিল্প বিবর্তন-বিমুখ নয়। তবে লোকায়ত সমাজ একই সমাজ ব্যবস্থায় আটকে থাকে বলে তার শিল্প মন্থরগতিতে বিবর্তিত হয়। লোক সমাজজীবন যদি দ্রুত গতিময়তা লাভ করে তার শিল্পের পরিবর্তনও দ্রুত হবে এটাই স্বাভাবিক কথা। বাঙলার লোকায়ত জীবন দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল শ্লথ গতিতে। মুসলমান শক্তির বিকাশে লোকায়ত সমাজ তেমন তরঙ্গ বিক্ষুব্ধতা লাভ করেনি। মুসলমানরা সমাজ বা অর্থ-নৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের কোন চেষ্টা করেনি। শুধু তাই নয় তাদের হাত ধরে কোন উন্নত ধরনের শিল্প আঙ্গিক প্রবেশ করেনি বাঙলায়। বস্তুত তারা উন্নত কোন শিল্প আঙ্গিক বহন করে না আনলেও, প্রচুরতর সহযোগিতা তাদের কাছে পেয়েছিল লোকায়ত শিল্পীরা।

ইংরেজের ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রথমত তারা এদেশে নিয়ে এল উন্নততর আধুনিক সভ্যতা, তেমনি তাদের সঙ্গে ছিল একটি বিজ্ঞাননিষ্ঠ শিল্প আঙ্গিক। অন্যদিকে তারা এদেশে পা দিয়েই শুরু করে অবাধ লুণ্ঠন। তারফলে সামাজিক পরিবর্তনগুলো দ্রুত এবং গতিশীল হয়ে ওঠে। একদিকে ধ্বংস হয় লোকায়ত সমাজ অন্যদিকে গড়ে ওঠে মধ্যবিত্ত সমাজ।

অতীত বাংলার সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করেছে সমাজের সব শ্রেণীর পারস্পরিক সহযোগিতার পথ ধরে। তা আর সম্ভব হ'ল না। তার ফলে কালীঘাটের পটের বিকাশ যেমন আকস্মিক অনিবার্য হয়েছিল তেমনি যে স্বতন্ত্র রূপ ধরে এগিয়ে গেছে। শিল্পধারার কালীঘাটের পটের যে বিবর্তন তার ভিতর দিয়ে সামাজিক পরিবর্তনের প্রাণস্পন্দন লাভ করা যায়। এতেই বুঝা যায় কালীঘাটের পটুয়ারা ছিলেন কি রকম সমাজ সচেতন।

কালীঘাটের পটের প্রথম দিকে ছিল দেবদেবীর পট আঁকার ঝোঁক। তার কারণ ভক্তরা তাদের আরাধ্য দেবতার মূর্তিই পছন্দ করতো। দীর্ঘ টানা লীলাময় রেখায় এগুলি এঁকে তোলা হত। পটগুলোতে রেখার জোড়েই এল প্লাসটিক ফর্ম। অথচ সব দেবদেবীই একেবারে প্রতিমা-লক্ষণাক্রান্ত। মাটির প্রতিমা যেন পটুয়ার রেখায় ধরা পড়লো। দেবদেবীর আঁকার এই ধারা চলছিল ১৮৩০ সাল পর্যন্ত।

১৮৩০ সালের পর থেকে কালীঘাটের পটে প্লাসটিক ভল্যুমের প্রতি আসক্তি তা যেন মন্থর হয়ে আসে। পটের বক্ষপটে এসে দাঁড়ায় রংয়ের বিলাস। পটের বিষয় বস্তুরও পরিবর্তন ঘটে। বিলেতি পোষাক এবং তার ব্যঙ্গ ভরা বিন্যাস। বোঝা যায় শিল্পীরা নাগরিক জীবনে আর শুধুমাত্র আগন্তুক নয়। প্রাথমিক স্তরে যে আত্মরক্ষার তাগিদ ছিল সে পর্যায় পার হয়েছে। ক্রেতাদের রুচি সম্পর্কে যেমন ধারনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তেমনি লোকায়ত সমাজের প্রতি তার কর্তব্য সে অনুভব করছে। নতুন কালের নতুন মানস চাহিদাগুলি তাদের শিল্পচেতনাকে আলোড়িত করে তুলছে।

বাংলার লোকায়ত সমাজের শিল্পীরা ইতিহাসের কোন পর্যায়েই সমাজ বিমুখ ছিল না। আকস্মিক বিপর্যয়ে, নাগরিক জীবনের স্পর্শে এবং ইংরেজ রাজশক্তির চমকের যে বিহ্বলতা তা কাটিয়ে উঠেছে। লোকশিল্পীসুলভ সমাজ সচেতনতা দিয়ে এইদাম্ভিক ক্ষমতাবান শাসককুলকে দেখেছে। অন্যদিকে ইংরেজ শাসন গেড়ে বসার মুহূর্তের বিদ্রোহগুলি তাদের স্পর্শ করে যাচ্ছে। একের পর এক বিদ্রোহগুলি যেমন তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিচ্ছিল তেমনি পটুয়ারা সহমর্মিতা অনুভব করছিল উৎপীড়িত জনগণের সঙ্গে। স্বভাবতই বিদেশীরা হয়ে উঠলো ঘৃণার পাত্র। অন্যদিকে বিদেশীদের প্রতি ছিল অজ্ঞতাজনিত সম্ভ্রম বোধ। কালীঘাটের পটের বিদেশী সাহেব সুবোদের রূপে এই দ্বিবিধ বোধ ধরা পড়েছে।

১৮৭০ সালের পর আবার আসে পালা বদলের পালা। কালীঘাটের বিষয়বস্তু হয়ে উঠলো বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন। সঙ্গে এল সমাজের নিয়মনিষ্ঠা ভঙ্গকারীদের প্রতি তীব্র বিদ্যুতের কশাঘাত। এরা হলেন ইষ্ট বঙ্গ সমাজের মানুষ। সমাজ বিমুখতা, ইংরেজের তর্কহীন দাসত্ব বরদাস্ত করতে পারেনি, কালীঘাটের পটুয়ারা। এইসব পটের পাশে পাশে আঁকা হয়েছিল ষ্টিল লাইফ, নানা রকম জীবজন্তু।

পটগুলি একথা প্রমাণ করে পটুয়ারা আর সমাজ বিবর্তনের শুধুমাত্র দর্শক নয়। ভাঙ্গাগড়ার পথ ধরে নতুন যে উচ্ছিষ্টভোগী সমাজ গড়ে উঠছে তাকে আপন সমাজ বলে স্বীকার করতে পারছে না। নতুন যে আধুনিক সমাজ গড়ে উঠছে তার আকর্ষণ থেকেও সে দূরে থাকতে পারছে না। অথচ আধুনিক যুগের দৃশ্যমান চরিত্রের ক্ষয়িষ্ণু এবং ব্যাভিচারী রূপ তার লোকায়ত

ধ্যান ধারণার জগতকে ক্লিষ্ট করছে। তাই এই গা জ্বালা করা চাবুক। বাস্তবিক কালীঘাটের পটের শেষ পর্যায়ের পটগুলি শুধু লোকশিল্পীদের ধিক্কারের স্মারক বললেই কথাটা শেষ হয়ে যায় না। পটগুলির পিছনে অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিহাস সংগোপনে দাঁড়িয়ে আছে।

ষ্টিল লাইফ এঁকে হয়তো শিল্পীরা অন্তর্দ্বন্দ্বের হাত থেকে মুক্তি খুঁজছিল। পাশ্চাত্য শিল্পের প্রতি পটুয়ার গোপন আসক্তির স্মারকও হতে পারে। আধুনিক জীবন বাঙলার জন জীবনে প্রবেশ করতে চাইছে; মধ্যযুগের শিল্প আঙ্গিক অচল হয়ে যাবে এটা সবার আগে বুঝতে পেরেছিল কালীঘাটের পটুয়ারাই।

দেখা যায় বাঙলার লোকায়ত সমাজের শিল্পীরা নতুন জীবনকে স্বীকার করতে পারেনি। ক্রমশই তাদের পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছিল। তাতেও লোকশিল্পীরা তাদের আঙ্গিক পরিবর্তন করতে না পেরে অবশেষে জীর্ণ হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। ব্যতিক্রম কালীঘাটের পটুয়া। নাগরিক জীবনের কেন্দ্রে ছিল বলে তারা টের পেয়েছিল অমোঘ পরিবর্তনের ধারা। তাই তারা নিজেদের পাল্টে নিতে চেয়েছিল। তারা আধুনিক যুগের চিত্রশিল্পী হতে চেয়ে ছিল। কিন্তু তারাও লোক-শিল্পীসুলভ জড়তায় পুতুল ও প্রতিমার জগতের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

পটের সময় নির্ধারণগুলি একেবারেই যথাযথ নয়। যথাযথ হবার কথাও নয়। কিন্তু এটা স্পষ্ট কালীঘাটের পটগুলি বিশ্লেষণ করে তৎকালীন সামাজিক বিবর্তনের অন্তর্জগতের ছবি পাওয়া যেতে পারে একথা সত্য।

ইংরেজদের হাত ধরে গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত সমাজ বাঙলার বুকে বিশেষ কোন সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন কি না তা বিতর্কের বিষয়। তবে তাদের হাত ধরে যে শিল্পের আত্মবিকাশ ঘটেছে তা আর যাই হোক তা যে বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ তা বলা যাবে না। দেশীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধ চেহারা নিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আবির্ভাব। সেই সংস্কৃতি অবলম্বন করে যা গড়ে তোলা হয়েছে তার আত্মাই বিদেশী। তাই নব্য সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালীর বৃহত্তর জনতা প্রথম থেকেই সম্পর্কহীন। অথচ এই নব্য সংস্কৃতির নায়করাও চরম ঔদাসীন্যে লুপ্ত হতে দিয়েছিলেন বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতিকে। এরা নিজেদের অসম্পূর্ণতাকে জয় করতে আত্মসমর্পণ করেছিলেন বৈদিক হোমাগ্নির কাছে। অথচ বাঙলার সংস্কৃতি আজন্মকাল বেদাচার বিরোধিতা করে এসেছে।

একথা মানতেই হবে বাঙলার বুকে পুনরুদ্ধারিত শিল্পকলা জনগণের সঙ্গে সম্পর্কহীন। জনগণের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোন শিল্পকলা দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারে না। তার স্বাস্থিকাল জন্মলগ্নেই জাত হয়ে থাকে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল পুনরুদ্ধারিত চিত্রকলার পরিণতি হলোও ঠিক তাই।

কালীঘাটের পটে কোন ক্লান্তি কাল নেই। তার আছে আকস্মিক সমাপ্তি। এটা সম্ভব হয়েছে শুধু একটা কারণেই। পটুয়ারা জনজীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেনি। তারা বাংলার লোকায়ত বিশ্বাস নিয়ে লোকায়ত জীবন বোধকে আধুনিক যুগের বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। তারা অশিক্ষিত এবং সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষ বলে পরিবর্তিত অধ্যায়ের দিকে এগিয়ে যেতে পারেনি।

কালীঘাটের পটের রেখার প্রাণধর্ম, তার আধুনিক যুগের প্রতি আগ্রহ, পুতুল ও প্রতিমার

অনুকৃতি এসব উল্লেখিত হলেও পটের চোখের বিশিষ্ট ভঙ্গিমার কথা উল্লেখ করা হয় নি। কালীঘাটের পটের চোখ পদ্মকোরকের কথা মনে করিয়ে দেয়। বস্তুত ভারতীয় চিত্রকলায় পদ্মকোরক আঁখি প্রায় প্রতি যুগেই ব্যবহৃত হয়ে অজন্তায় এক বিশেষ বাঙময়তা লাভ করে। একই চোখের বিন্যাসের সামান্য হেরফেরে মনের আবেগ, তন্ময়তা, উদাসকরা বৈরাগ্য প্রভৃতি ভাবাবেগ আশ্চর্যরূপে রূপায়িত হয়ে ওঠে।

কালীঘাটের পটুয়ারা পদ্মকোরক আঁখি ব্যবহারে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল তা পটগুলোতে ধরা আছে। আশ্চর্য এই বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে প্রচলিত ধারণার বাইরে পটুয়ারা যেতে পারেনি। অথচ আধুনিক নগরের চলমান জনজীবনের বিষয়বস্তুতে পরিণত করতে গিয়ে কালীঘাটের পটুয়ারা দ্বিমাত্রা বোধের অনড় জগৎকে ভেঙ্গে ফেলেছিল। এমন সব নাটকীয়তা এনেছিল যা লোকচিত্রে এর আগে আর দেখা যায়নি।

লোকচিত্র একটা নির্ধারিত দৃষ্টিকোণ থেকে গড়ে ওঠে। শিল্পী অনুসন্ধান করে কোন কেন্দ্র থেকে বিষয়বস্তু দেখলে তার আঁকার পক্ষে সুবিধা সব থেকে বেশী। এমনি নির্বাচিত দৃষ্টিকোণ এমন এক পরম্পরা সৃষ্টি করে যে লোক শিল্পীরা তার বাইরে যেতে পারে না। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় বা তার কিছু আগের মন্দিরগুলির টেরাকোটা ভাস্কর্যের যে নমুনা আছে তাতে দেখা যায় টেরাকোটা শিল্পীরা বিষয়বস্তু পরিবর্তনের প্রয়াস পেয়েছিল। তারাও বাঙালীর অন্তরঙ্গ জীবনের স্মারক যেমন তৈরী করেছে তেমনি বিদেশী মানুষগুলির জীবন যাত্রাও বাদ দেয়নি। তারা লোক শিল্পীদের ধারা অনুযায়ী একই দৃষ্টিকোণের নিয়ম রক্ষা করেছে। বিষয়বস্তুকে নানা দিক দিয়ে ঘুরে দেখার চেষ্টা করেনি। কালীঘাটের পটুয়ারা এখানেও একটা ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছে। লোকশিল্পী সুলভ পরম্পরাজাত দৃষ্টিভঙ্গীর দাসত্ব করেনি। চিত্রটি কোন কেন্দ্র থেকে দেখলে তা যথার্থ চরিত্র নিয়ে জেগে উঠবে পটে, কালীঘাটের পটুয়ারা তা বিলক্ষণ জানতো। একজন আধুনিক চিত্রকরের মত তারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করতে পারতো।

তার ফলে পটের দেহভঙ্গিমায় এল বৈচিত্রের মিছিল। ফুটে উঠেছে নানা দিক থেকে দেখা অঙ্গবিন্যাস। ছবিতে একটা নাটকীয় সুর বিধৃত হয়ে গেল। আমদানী হল বৈচিত্রময় নানারকম ফোরশর্টিং যা পূর্বের লোক চিত্রকরদের কাছে ছিল একেবারেই অজ্ঞাত।

তাই বলে পটের জগতে অসম্পূর্ণতা ছিল না তা নয়। পটের সব থেকে বড় দুর্বলতা তার আধুনিক হয়ে ওঠার চেষ্টার সীমাবদ্ধতা। কালীঘাটের পটুয়ারা অঙ্কন ধারায় নানারূপ পরিবর্তন আনলেও তা এমন এক সীমাবদ্ধতায় বাঁধা পড়েছিল যে তাকে অভিনব হতে সামাজিক কেচ্ছা কাহিনী নির্ভর হয়ে পড়তে হয়েছিল। নয়তো ব্যাভিচার কাহিনী এমন তীক্ষ্ণধারে আত্মপ্রকাশ হয়তো করতো না পটে। পটের অসাহায্যতা পটুয়ারা হয়তো অনুভব করেছিল কিন্তু নতুন আর কোন উত্তরণ পটে আসতে পারেনি। কালীঘাটের পট পটভূমিহীন পুতুলের জগৎ। বস্তুত দৃশ্য বা ঘটনার যে একটা পটভূমি থাকে যাকে বলা হয় ব্যাকগ্রাউণ্ড তা পটুয়ারা সৃষ্টি করতে পারেনি। পুতুল ও প্রতিমা লক্ষণাক্রান্ত পটের দ্বিমাত্রা বোধের প্রতীক ও নকশামুখী ব্যাকগ্রাউণ্ড অচল। অথচ নতুন কোন ব্যাকগ্রাউণ্ড পটুয়ারা সৃষ্টি করতে পারেনি। তাই পট হয়ে পড়লো মঞ্চহীন

নাটকের মত এক বিচ্ছিন্ন দৃশ্য। দীঘল বা জড়ানো পটে ব্যাক গ্রাউণ্ডে যে নদীর শান্ত স্রোত, উদাস বাতাসের প্রবাহ, আকাশের প্রসারতা, গাছপালার স্নিগ্ধ শান্তি, দৃশ্য জগতের বুকে অদৃশ্য জগতের ছায়ার কম্পন তা থেকে কালীঘাটের পট অনেক দূরে। তারফলে কালীঘাটের পট একটা বিচ্ছিন্ন দৃশ্য হয়ে থেকেছে। এমন অসম্পূর্ণ ছবি দীর্ঘ জীবন লাভ করতে পারে না।

অনেক কালীঘাটের পট-প্রেমিক কালীঘাটের পটের অপমৃত্যুর পিছনে এক বর্বর যুগের আবির্ভাব কল্পনা করে থাকেন। বস্তুত তেমন কোন বর্বর যুগের আবির্ভাব ঘটেনি যার হাতে ছিল কালীঘাটের পটুয়ার মৃত্যুর পায়োয়ানা। কালীঘাটের পটুয়ারা নিজেরাই তাদের অপমৃত্যু ডেকে এনেছিল। এর অন্যথা হবার বোধহয় অন্য কোন উপায় ছিলনা।

লোকচিত্রকর যখন তার সামাজিক বিশ্বাসের জগতে বাস করে তত সময় সত্যি সে অমর। এই সামাজিক পরিমণ্ডলের বাইরে বের হয়েও লোকায়ত শিল্পী বাঁচতে পারে সে যদি দরবারী শিল্পের জগতে প্রবেশ করে অথবা বিবর্তনের পথ ধরে এগিয়ে চলে। কালীঘাটের পটুয়ারা আধুনিক যুগের চিত্রকর হতে চেয়েছিল অথচ লোকচিত্রকরের স্বভাব সে বর্জন করতে পারেনি। আবার আধুনিক হবার মাদকতায় লোকচিত্রকলা থেকে সে সরে গিয়েছিল অনেকটা দূরে। দীঘল পটুয়ারা এ ভুল করেনি বলে এখনো তাদের দেখা যায় বাঙলার গ্রামের আনাচে কানাচে। দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ এতবড় ঘটনাগুলি পরপর ঘটে যাবার পরও তাদের পদধ্বনি বাঙলার গ্রাম্যপথ থেকে একেবারে মুছে যায়নি। ট্রাকটরে চষা জমির আলপথ দিয়ে হয়তো চলছে কোন পটুয়া যার বগলে একখানি জড়ানো পট। এরকম একটা দৃশ্য কল্পনা একেবারে অবাস্তব নয়। অথচ কালীঘাটের পট ও পটুয়া নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে অনেক আগেই। আকস্মিক যেমন তার আগমন তেমনি আকস্মিক তার অবলুপ্তির সীমা।

কালীঘাটের পটুয়ারা কালীঘাটের পট সৃষ্টির সূচনায় আঁকতো ধর্মীয় পট। সঙ্গে আঁকতেন পৌরাণিক পট। ধর্মীয় পট তীর্থযাত্রীরাতো সংগ্রহ করতেনই অনুমান করা যায় দু'চারখানা পৌরাণিক পটও থাকতো। পৌরাণিক কাহিনীর ভিতর থেকে গণ-সমাজ রূপের জগতে অরূপের ব্যঞ্জনা অর্জন করতো। কালীঘাটের পটুয়ারা অভিনবতার লোভে এবং নগরবাসীদের ক্রেতায় পরিণত করার লুব্ধতায় বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন চিত্রায়ত করার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ধীরে ধীরে ধর্মীয় পট এবং পুরাণ পট আঁকা বন্ধ হয়ে যায়। অনুমান করা যায় নগর জীবনের সাধারণ মানুষদের পটের জগতে তারা প্রলুব্ধ করতে পেরেছিল। নাগরিক রুচিবোধের সীমাকে মেনেই কালীঘাটের পটে আবির্ভাব ঘটে রংয়ের। পটুয়ারা বুঝতে পারেনি নাগরিক রসবোধ স্থায়ী নয়, প্রতিনিয়ত পাল্টায়। অথচ জনরুচির পরিবর্তনের গতিময় ধারার সঙ্গে পটুয়ারা বেশী দূর এগোতে পারেনি। গণসমাজের প্রতি দুর্বলতা, আধুনিক যুগকে বোঝার অন্তত তাদের একটা স্থায়ী কেন্দ্রে আবদ্ধ করে ফেলেছিল।

বাঙলার লোকায়ত শিল্প বেদাচার বিরোধী। তাদের বিবর্তন বেদাচার বিরোধী আন্দোলন অবলম্বনে। প্রথমে এরা বৌদ্ধ। এরাই বৈষ্ণবধর্মের অনুগত। পরে এরা মুসলমান। কোন কালেই গণসমাজের প্রবহমান ধারা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেনি। অথচ ধর্মীয় ও পৌরাণিক কাহিনী বর্জন করে প্রবাহিত ধারা থেকে নিজেদের বিচ্যুত করে নাগরিক জীবনের বাতায়ন খুলতে

চাইল। বাঙালীর উনবিংশ শতাব্দী হল ইংরেজী শিক্ষা, ধ্যান ধারণার কাছে নিসর্ত আত্মসমর্পণের যুগ। কালীঘাটের পটুয়া হল সম্পূর্ণ তার বিরোধী। তারফলে পাশ্চাত্য চিত্রকলা রহস্য সে অনুধাবন করার প্রয়াস পায়নি। বস্তুত এই নতুন আসা শিল্প আঙ্গিককে তারা দেখেছিল বৈরীতার দৃষ্টি নিয়ে। হিন্দু মেলার নায়করা ক্যাম্বিসের কাপড়ে এদের দিয়ে পাশ্চাত্য চিত্রকলার অনুকরণে ছবি আঁকাবার চেষ্টা করেছিলেন একথা অজিত ঘোষ মহাশয় বলেছেন। তার ফল কি হয়েছিল তা উল্লেখ না করলেও চলবে।

তারফলে বিদেশী পাশ্চাত্য চিত্রকলার মুদ্রিত প্রতিলিপি যখন ছড়িয়ে পড়লো, সেই তরঙ্গের সামনে কালীঘাটের পটুয়ারা দাঁড়াতেই পারলো না। আধুনিক মানসিকতা ততদিনে নাগরিক মনকে তৈরী করে নিয়েছে। বাঙালীর গণচেতনাও আধুনিকমুখী হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ উল্লেখের অবকাশ নেই। কালীঘাটের পটের ক্রেতা দ্রুত কমে যাবে এতো স্বাভাবিক কথা।

ধর্মীয় পট ও পৌরাণিক পট আঁকা বর্জন এবং পাশ্চাত্য চিত্রকলার প্রতি অনাসক্তি, মধ্যযুগীয় জড়তার পথ ধরেই কালীঘাটের জীবন ধারায় নেমে আসে অপমৃত্যুর যবনিকা।

মন্ত্রচর্যা ও লৌকিক বিশ্বাস

অজিতকুমার মিত্র

বাঙলার জনস্তরের গহনধারায় লৌকিক বিশ্বাসের বিজ্ঞানসম্মত রীতি নিয়ম বা গতি প্রকৃতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে একথা অবিসম্বাদিত যে আদিম মানুষের ভীতিভাবনা জনচরিত্রের মৌল জীবনভাবনাকে যেভাবে প্রভাবিত করে এসেছে তা' একটু লক্ষ্য করলে আজও অব্যাহত দেখা যায়। শংকাতুরতা এই মৌল রীতি নিয়মকে গতিশীল রাখে। সেইজন্য আদিম কাল হতে বাঙলার জলা-জংগলে, জলে-ডাংগায় যে জীবন লালিত হয়ে আসছে তার রক্ষাকবচের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তাই গণ-জীবনে নানা প্রকার লৌকিক রীতি নিয়ম সমাজ ধারাকে সঞ্জীবিত রাখে। আজও তার ব্যত্যয় দেখা যায় না।

সমাজ-বন্ধনের আদিতে তাই নানা প্রকার বন্ধনের চিন্তা আদিম মানুষকে উদ্বেলিত করে। বাঁধন ছেড়বার আকুলতাই ঘর বাঁধার স্বপ্নকে স্বার্থক করে তোলে। আধিভৌতিক ভীতিভাবনা এই বন্ধনকে সার্থক করতে গিয়ে মন্ত্রচর্যার ধারা সৃষ্টি করে। মন্ত্রচর্যা প্রাচীন মানুষের বাঁচার সাধনা। মানুষের শংকাতুরতা মন্ত্রচর্যার অবলম্বনে আদিম সমাজ-বিজ্ঞানকে রীতিবদ্ধ হতে, সমাজ গঠনের মধ্যে ব্যক্তিজীবন বিন্যাসকে নিয়মবদ্ধ করে। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে যে বৌদ্ধ সাধন প্রক্রিয়া বাঙলাদেশে বিকশিত হয়ে ওঠে তার মূলে জনস্তরের আদিম ধারা রূপলাভ করে এবং খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হতে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারা পরিবর্দ্ধিত হয়। প্রাক্ চৈতন্য-যুগ পর্যন্তই গণ-চরিত্রের জীবন-ধারার সার্বিক রীতি-নিয়ম লৌকিক বিশ্বাসের উৎকট শংকাতুরতায় সমাজ-বিন্যাসের পর্যায়ে পর্যায়ে নানান সংস্কার বাধা নিষেধ করা আর না করার নির্দেশ, বিশ্বাস, আচরণ যে জীবন-ভাবনার গতি প্রকৃতি রীতিবদ্ধ রাখে সেখানে সুদীর্ঘকাল আদিম মন্ত্রচর্যা সমাজ-জীবনের সুদুঃসহ আতংক হতে সমাজ-মানসকে যূথবদ্ধ হতে সাহায্য করে। ব্যক্তি জীবনের আতংক শংকাকুল রাখে মানুষকে। তাই আদিম জনস্তরে মন্ত্রচর্যা ও তুকতাক ও নানা প্রকার আভিচারিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া মানুষের জীবন ভাবনার মৌল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

তাই বন্ধনধারা সমাজবন্ধনকে রীতিবদ্ধ করে। এই জীবনধারা সমাজ-জীবনকে গতিশীল রাখে। বন্ধনই সমাজ-বন্ধন সৃষ্টি করে। এই বন্ধনধারা সমাজ-বন্ধনকে দৃঢ় সন্নিবদ্ধ করে। দেহ বন্ধনই আদিতে আদিম মানুষের শংকা হতে নির্বিঘ্ন রাখার অন্যতম উপায় হয়ে দাঁড়ায়। অলৌকিক শক্তি-সামর্থই লৌকিক জীবনকে একমাত্র নির্বিঘ্ন রাখে। এই মন্ত্রচর্যার দ্বারা দেহবন্ধন প্রক্রিয়া বিঘ্ন-সংকুল জীবনযাত্রাকে সুন্দর করে। এই সকল মন্ত্রগুলি সাধারণ বাংলাভাষায় লিখিত। দেহবন্ধনের মূলে অদ্ভুত মানসিকতা কাজ করে। আধিভৌতিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ায় দেহকে অলৌকিক শক্তির সাহায্যে বন্ধন দেওয়ার যে বিশ্বাস আদিম সমাজে অনুসৃত হতে থাকে সেই ধারা আজও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তাই সংস্কৃত মন্ত্রের নাগপাশে বাঙালীজীবন তটস্থ হলেও—দশকর্মে, দেবারাধনায় সব কিছুতেই সংস্কৃত মন্ত্রের অতি প্রচলন থাকলেও আজও বাংলা মন্ত্রের প্রচলন আদিম জনস্তরের নানান ক্রিয়া প্রক্রিয়ায়

আভিচারিক ক্রিয়াকাণ্ডে প্রচলিত হয়। তাই একথা অত্যুক্তি নয় যে এই সংস্কৃতি আরোপিত নয়। হয়তো শতাব্দীর পর শতাব্দী পূর্বদেশজ স্তরে মানুষের কথা বলা ভাষায় মন্ত্রগুলি রচিত। ভাষা হারালেও মন্ত্র রচনার ধারা হারিয়ে যায় নি। তাই বাঙলাদেশে সংস্কৃতের নাগপাশ মুক্ত হয়ে এই সকল মন্ত্ররচনার পরীক্ষানিরীক্ষা হয়ে এসেছে যুগের পর যুগ। বাংলা মন্ত্রের ধারা তাই আজও অব্যাহত। কোন ব্যতিক্রম হয়নি। বেদের ভূতপ্রেত তুকতাক প্রভৃতি মন্ত্র রচনার ধারা দেশীয় মানসিকতার প্রভাব ছাড়া আর কিছু নয়। কেন না আর্য সংস্কৃতি যেখানে বিভিন্ন যুক্তিনির্ভর দার্শনিকা ছাড়া আর কিছু নয় সেখানে বিশ্বাস আর ইচ্ছা এবং গোষ্ঠীর উপর আধিপত্য বিস্তারের মানসিকতা যে জীবনদর্শনের সূচনা করে তাই মূলতঃ বাঙলাদেশে আজও আদিম মানসিকতাকে লালিত করে চলেছে।

সেই জন্য বেঁচে থাকার আকুলতাই এই জীবনদর্শনের মূলকথা। মোক্ষ মানুষের কামনা নয়। মৃত্যুর পর ভাল থাকার দুর্ভাবনাতে বাঙলার দর্শন তৈরী হয়নি। ভাল করে বাঁচার সাধনাই বাঙালীর প্রকৃত জীবনদর্শন। এই সকল মন্ত্রচর্যার মধ্যেও তাই দেখা যায় বেঁচে থাকার নিবিড় সাধনা। বিঘ্ন-সংকুল জীবনকে নির্বিঘ্ন রাখতে তাই মন্ত্রচর্যার সাহায্যে নানা রকম বিধিনিষেধ তৈরী হয়। মন্ত্রচর্যার বিভিন্ন রীতি প্রকৃতির কথা বাদ দিলেও বন্ধন-ধারার আলোচনা করলে দেখা যায় যে আদিম মানুষের জীবন বন্ধন বেঁচে থাকার যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করে তাই বিভিন্ন মন্ত্রে ও আভিচারিক ক্রিয়া-কর্মে প্রকাশিত হয়। আটকে রাখার আকুলতাই বন্ধনধারার সৃষ্টি করে। তাই আদিম মানুষেরা খেতে, শুতে, চলতে ফিরতে যে শংকাতুরতা তাই বেঁধে রাখার ব্যাকুলতায় জীবন বন্ধনের সৃষ্টি হয়। নানা প্রকার ক্রিয়াকাণ্ডের সাহায্যে জীবন-বন্ধনের যে ধারা সৃষ্টি হয় তারই পর্যালোচনায় ঈশ্বরের প্রয়োজন হয়নি। সেই জন্য একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে স্বর্গলোক সৃষ্টির পূর্বে প্রেতলোকের প্রয়োজন হয়। অলৌকিক বিশ্বাস লৌকিক মানুষকে ঈশ্বর সম্বন্ধে উদাসীন করে তোলে। অলৌকিকতার প্রভাবে মানুষ অমর হতে পারে। মৃত্যুর পর ফিরে আসতে পারে। মন্ত্রচর্যার সাহায্যে জীবনবন্ধন সৃষ্টি করতে পারলে বিঘ্ন ভয় থাকে না। তাই আসন বন্ধন, খাদ্যবন্ধন, নিদ্রাবন্ধন, ভূতবন্ধন, প্রেতবন্ধন প্রভৃতি। বিভিন্ন বন্ধন প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানুষ নিজেকে নিবিঘ্ন রাখতে সচেষ্ট হয়। দেহবন্ধন তাই সমাজ গঠনের আদিতে মানুষের মধ্যে যে স্বস্তি জাগিয়ে তোলে তাই আজও সমাজ বিকাশের মর্মমূলে কাজ করে চলেছে। শরীরকে বেঁধে রাখার এই দৈব প্রচেষ্টা বিভিন্ন আভিচারিক মন্ত্র ও রীতি নিয়ামককে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে।

গা বাঁধা মন্ত্র—

ভাসের কান্দে মই অর্জন চাঁটের বাঁট।
আমি বাইরে গুরু পুত্তর লাগ ছাড়েন রে লাট॥
আমাকে দেখে লড়িস চড়িস বাড়াস তুও।
খাস তুই একেশ্বরের মুও॥
কার দোহাই মা মনসার দোহাই॥

দেহকে মন্ত্রপূত করে রাখার রীতি আর্য মানসিকতাকেও এমনভাবে প্রভাবিত করে যে নানা রকম

সংস্কৃত মন্ত্রেরও সৃষ্টি হয়। কিন্তু আর্য দর্শনের মূলে দেহ সম্বন্ধীয় ধারণা অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু আদিম মানুষের চিন্তায় দেহ সর্বস্বতা যে দর্শনের জন্ম দেয় তাই পরে বিভিন্ন দর্শনকে প্রভাবিত করে। দেহ বন্ধন তাই অ-আর্য জীবন দর্শন। আত্মরক্ষার প্রয়াসেই কোন আদিমকালে এই রীতির উদ্ভব। দেহ বন্ধনের ঐন্দ্রজালিক প্রয়াসে নানা অপশক্তির হাত হতে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায়।

দেহবন্ধনের পর গৃহ বন্ধন। আদিম মানুষের গৃহজীবন সদা সন্ত্রস্ত। তাই দেহবন্ধনের পর গৃহবন্ধনের ভাবনা মানুষকে ব্যাকুল করে তোলে। সেইজন্য নানান প্রক্রিয়ায় বাড়ী বন্ধনের রীতি প্রচলিত হয়। অবশ্য আর্য জীবন ধারায় এই সকল রীতি অনুপ্রবিষ্ঠ দেখা যায়। তার অর্থ এই নয় যে আর্য জীবনধারা হতে এইসকল ধারণা দেশীয় ভাবনাকে প্রভাবিত করে। কেন না আর্য-মানসিকতা যুক্তি নির্ভর। কিন্তু অ-আর্য্য আদিম জীবনধারার মূলে শংকাতুরতা সদা জাগ্রত। তাই এই বন্ধনরীতি আদিম মানুষের জীবন ধারণের আতংক হতে পরিস্ফুটিত হয়। সেইজন্য এই কথা অবিসম্বাদিত যে আর্য্য মানসিকতা দেশীয় রীতি নিয়মকে কুক্ষিগত করে দেশীয় জীবন ভাবনার সাথে ঘাত-অভিঘাত আর সংঘর্ষ সমন্বয়ের মাধ্যমে। তাই কত বিচিত্র গৃহ বন্ধন প্রক্রিয়া যে সমাজ মানসে আজও প্রচলিত তা' ভাবতে অবাক লাগে। মন্ত্রপূত সরিষা গৃহের চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার মানসিকতা বহু পুরোনো আমল হতে দেশীয় জীবন বিকাসের চির প্রচলিত রীতি। গৃহবন্ধন করলে অপশক্তি বাড়ীর ত্রিসীমানায় পৌছতে পারবে না এই লৌকিক বিশ্বাস মন্ত্রচর্য্যাকে বেগবান রাখে। তার জন্য বিভিন্ন ক্রিয়া কত রীতি প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে যে সকল ক্রিয়া প্রক্রিয়া সমাজে প্রচলিত হয় একটু লক্ষ্য রাখলে দেখা যায় যে এই সকল ধারা পরস্পরের পরিপূরক। শংকাতুরতা থেকে লৌকিক বিশ্বাসের জন্ম হয়। আবার এই বিশ্বাসের মূলেই মন্ত্রচর্য্যা। কখনও আবার বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডে যে লৌকিক চিত্রাংকণ ও জীবনধারার লৌকিক রীতি প্রবর্তন করে তা' বাঙালী জীবন ভাবনায় বিভিন্ন রীতি প্রকৃতিতে পরস্পরের পরিপূরক। তাই দেখা যায় কখনও লোকশিল্পের ধারার নতুন করে প্রবর্তনা আবার কখনও জীবন ভাবনার ব্যাপ্তি। আদিম মানুষের নানান চিন্তারীতি জীবন যন্ত্রণা নানান সংস্কারে রূপ লাভ করে।

বাড়ীবন্ধন মন্ত্র :—

বাড়ী বান্দলাম বালজুরি।
আর বান্দলাম পুব দুয়ারী॥
কে যায় বীর হনুমান।
আমি যদি গুরুর পুত্তুর।
ছেড়ে দেন রে বাট।
মারেন তো লাগুঘাট॥
বাঢ বাগে পড়লো বজ্রের কপাট।
আমি যে বান্দলাম বাড়ীঘর
সব আমার বন্ধ হয়ে থাক।
কার দোহাই মা মনসার দোহাই॥

দোহাই দেওয়ার এই রীতি লৌকিক। সবলকে স্মরণ করার প্রবণতা থেকে এই ধারা হয়তো আদিমকালে প্রচলিত। এই সকল মন্ত্র মনসার দোহাই ও সবলের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার কথা প্রকাশ করে। এই মনসা আর্যদেবী নহে। শংকাতুরতা থেকে রক্ষা পাবার ব্যাকুলতা এই দেবীর জন্ম দেয়। আর্য জীবনধারা এই সব দেবতাদের কুক্ষিগত করে নেয় অ-আর্য চেতনার সাথে আপোষ মানসে। মানসা মারী ভয় দূর করে। সর্পভয় দূর করে। ধনরত্ন সপ্তডিংগা উদ্ধার করে দেয়। কিন্তু মোক্ষ পাওয়া যায় না। তাই মনসা অ-আর্য দেবতা।

আদিম মানুষ বিশ্বাস করতো মন্ত্রপূত বাণ মেরে মানুষ মানুষের ক্ষতি করতে পারে। আগুনের হলকা আকাশে ছুটে যায়। যার নাম উদ্দেশ করে এই বাণ মারা হয় তাকে খুঁজে বের করে আঘাত হানে। এই বাণ তৈরী করবার সময় হলুদরাঙা নতুন কাপড়ের টুকরোর মধ্যে বিভিন্ন দ্রব্য যথা অপমৃত্যুতে মৃত নারীর কেশ, ধুনার-গুড়ো আর আবীর এবং শণের পোটলা পাকিয়ে ঐ কাপড়ের টুকরোয় বেঁধে মন্ত্রপূত নানান আভিচারিক ক্রিয়াকাণ্ডের পর শত্রুর উদ্দেশ্যে ছুড়ে মারার আদিম প্রক্রিয়া বাণমারা বলে অভিহিত হতো। সত্যিই নাকি আকাশ পথে ছুটে চলতো আগুনের হলকা। মন্ত্রপূত শত্রুর উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত বাণ আকাশ পথে যাওয়ার সময় তাকেও বন্ধন করার মন্ত্র চর্চা হয়ে এসেছে অতীত বাঙলার আদিম সমাজ হতে এমনকি আজও নানান প্রক্রিয়ায় বাণ বন্ধন মন্ত্র আওড়ানো হয়।

বাণবন্ধন মন্ত্র :—আইসে ফিরিলাম মংগলবারে।
বাণ বান্দিলাম তার দুভারে॥
যেখানে বান্দিলাম্ বাণ সেইখানে থাক।
যদি কেটে যাস ঈশ্বর ভগবানের মাথা খাস॥

বাণ বন্ধন মন্ত্রের মধ্যে কি আছে যে আকাশ পথে আগুনের হলকা আর যাওয়ার পথ পায় না। অনেক উপকথায় জানা যায় যে আকাশের অগণ্য তারকা আর কিছু নয় এমনি বাণ বন্ধন হয়ে আবহমান কাল রয়ে গেছে। আদিম মানুষের ধ্যান ধারণায় মানুষের জিঘাংসা, আক্রমণ আর প্রতিশোধ নেওয়ার আগ্রহ সবই আছে। বর্তমান কালের মত গুপ্ত হয়, গুপ্ত চক্রান্ত সত্যই আদিম মানুষের গুপ্তবিদ্যার থেকে আরও ভয়ংকর।

এই সকল মন্ত্রগুলোর মধ্যে সত্যই কি কোনো শক্তি থাকা সম্ভব। ভাষার সারল্য অবশ্যই মুগ্ধ করে। তবে ভাষার মধ্যে আক্রমণের বেগ সকল সময়ই স্পষ্ট অনুভূত হয়। তবে বহু মন্ত্রে ভাষার দুর্বোধ্যতা পরিলক্ষিত হয়। তাই মনে হয় কোন দুর্বোধ্য ভাষায় মন্ত্রগুলো হয়তো রচিত হতো। বহুকালের চলার পথে মন্ত্রগুলো ভাষান্তর গ্রহণ করেছে কিন্তু তার দুর্বোধ্যতা রয়ে গেছে কোথাও কখনও। এই মন্ত্রের ভাষার কোন ক্ষমতা নেই। হয়তো মন্ত্রপাঠক গুণিদের ইচ্ছাশক্তি বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যগুণের সাথে এমন পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতো যে কোন বিশ্বতকাল হতে বিভিন্ন লৌকিক বিশ্বাস সমাজমনে দৃঢ় মূল হয়ে আছে এমনকি আজও। উপাসনায়, উপনয়নে, শ্রাদ্ধে, মৃতদেহ সংস্কারে, নিদারুণ প্রভাবের বাইরে এই বাংলা মন্ত্রচর্য্যা দিনের পর দিন বাঙালী সমাজে অনুশীলিত হয়ে এসেছে। এই ধারা স্তিমিত হলেও এখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

বৈদিক সূক্তিতে সমাজ প্রবাহ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

আমাদের ভারতীয় সমাজের সর্বাধিক পুরাতন ধারার নজির কিসে পাওয়া যায়? এ কৌতূহল যেমন শিক্ষিত-সমাজের বহু পুরাতন, তেমনি কথায় কথায় বৈদিক সূক্তির উদাহরণ তুলে তুলে প্রমাণ করার চেষ্টাও চলে আমাদের সনাতন ধারার ইতোবৃত্তের প্যাঁচরা, ওতে সব পাওয়া যায়, আমরা কি ছিলাম, কি পেয়েছি কি রক্ষা করে চলেছি।

সেই প্রসঙ্গের কয়েকটা দিক্ তুলে বলা যায়, সনাতন বা অচল সত্য বলে বেদের সূক্তিতে অন্ততঃ সমাজ বিবর্তনের ধারায় সে ইঙ্গিত নাই, বরং সামাজিকক্ষেত্রে অর্থনীতিক বিবর্তনের সঙ্গে সমাজেরও যে পরিবর্তন হয়েছে তেমন সূক্তি প্রচুর রয়েছে।

কথাটা এই যে, মানব-সমাজের অর্থনীতিক পরিবর্তনের ভিত্তিতেই সামাজিক পরিবর্তনের রূপান্তর ঘটে ইহা যদি সনাতন ধারা হয় তবে বলা যায় তেমন সনাতন সত্য কথাই বেদে আছে। এর সঙ্গে সমাজস্থিত মানবেরও চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটে। আবার অর্থনীতিক পরিবর্তনের ভিত্তিতেই সামাজিক রাষ্ট্রের বিবর্তন হয়, আর তার দ্বারা রাজনীতিক রাষ্ট্রেরও পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ হয়, এ চিত্র তো প্রতিটি বেদের ছত্রে ছত্রে!

মানব-সমাজ প্রবহমান শক্তির দ্বারা গতিশালী তাই সামাজিক রূপ স্থির থাকে না, দ্বন্দ্বভাবের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়, এবং বস্তুতান্ত্রিক বাতাবরণের মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রেরও রূপ গঠিত হয়।

এই বিবর্তনের মধ্য দিয়েই মনোবিজ্ঞান, আত্মজ্ঞান জন্ম নেয় এবং সেই জ্ঞান বিজ্ঞানই আবার পরিবর্তিত সমাজে প্রভাব বিস্তার করে কিন্তু কোন জড়বস্তুই নিজের প্রভাবকে সমাজে ঘটাতে পারে না, ব্যক্তিত্বের প্রভাবই সমাজে বিস্তৃত হয়। আপাততঃ দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে সমাজ-শরীরে আত্মতত্ত্ব-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারাই বস্তুতান্ত্রিকতার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। কারণ জড়ের তো চেতনা নাই কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির তা আছে, এই বাস্তব বিজ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা আমাদের সুদূর অতীতের ভারত ভূখণ্ডের মানব ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পাই বৈদিক সভ্যতা এবং পৌরাণিক সভ্যার ক্রমবিকাশ।

দুটি সভ্যতার মধ্যেই দেখতে পাই সংশয়বাদ ও সিদ্ধান্তবাদ। বৈদিক ঋষিদের মানব দৃষ্টিতে এই জগৎ ক্রমাগত পরিবর্তনশালী একটি অনন্তকালের ধারা, আর পৌরাণিক দৃষ্টিতে এ সংসার ঈশ্বরের মানব-লীলার লীলাক্ষেত্র।

বৈদিক সভ্যতার ক্রমবিকাশের সূক্তি চিহ্নগুলি অনুশীলন করলে দেখতে পাই মানবের মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তার ধারা ক্রমাগত দ্বন্দ্বভাব দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, আবার দ্বন্দ্বভাবটি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ রূপেই জন্ম নিচ্ছে, অগ্নির স্তুতি হওয়ার মধ্যেই সংশয় উঠেছে কে সে অগ্নি, কাকে আহ্বান করবো। আবার সিদ্ধান্ত, আবার দ্বন্দ্ব।

অতএব ধরে নিতে হয় বৈদিক সভ্যতায় স্থিত মানব-সমাজকে জানার জন্য তৎকালের

অর্থনীতিক গতাগতিটা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো সেইটাই বৈদিক সূক্তিগুলিতে অনুসন্ধানের বিষয়।

নইলে কেমন করে জন্ম নিতে পারে পরস্পর ভিন্নমুখী চিন্তাপ্রসূতি কপিল, কনাদ, বৃহস্পতি, চার্বাক ধর্মকীর্তি, দিঙ্‌নাগ পাতঞ্জল প্রভৃতির মস্তিষ্কে?

এ সব মস্তিষ্কে কি বৈদিক সভ্যতায় অবস্থিত মানব সমাজের মননশীলতা জন্ম নেয় নি? পরিষ্কার বোঝা যায় বৈদিক সভ্যতার অর্থনীতি ভিত্তির সংস্কারের লেশও যেন এদিকে ছুঁতে পারেনি। তাছাড়া এই যে প্রচলিত বুনিয়াদী শ্রেণী স্বার্থের সঙ্গে জড়ান পুরোহিত তন্ত্রবাদের ভারতীয় সভ্যতার রূপ, এও তো বৈদিক সভ্যতাকে স্পর্শও করে না?

তাহলেই আকর্ষণ জাগে জানতে যে বৈদিক সভ্যতার মধ্যেই কি মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস কাহিনী বিধৃত হয়ে আছে? যদিই বা তা থাকে তাহলে কি আমাদের বৈদিক সূক্তিগুলি চিরন্তনী সংস্কৃতির ধারক নয়?

এমন কৌতূহল জাগার পিছনে সবচেয়ে বেশী প্রেরণা জাগিয়েছে মহেন-জো-দাড়ো ও হরপ্পার সভ্যতার ধরণ ধারণের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার। কারণ বর্তমানে যাঁরা সুখ্যাত পণ্ডিত তাঁরা একবাক্যেই স্বীকৃতি দিয়েছেন এই দুই স্থানের সভ্যতা একই ধরণের ছিল এবং এক বৃহত্তর সভ্যতার অন্তর্গত ছিল। প্রায় সত্য অনুমানের দিক থেকে খ্রীষ্টপূর্ব চারহাজার বৎসর পূর্বে ঐ দু জায়গার সভ্যতা ছিল সর্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় এবং পূর্ব পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতার নিবিড় যোগাযোগ কেন্দ্র।

এই দুই স্থানের নর কঙ্কাল পরীক্ষা করে পণ্ডিতরা স্থির করেছেন তাতে দেখা যায় বর্তমান আখালা জেলাটি ছিল 'ব্রহ্মাবর্ত' দেশ, এবং এদেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানব এসে মিলিত হতেন।

সেই মিলন ভূমিতে প্রোথিত বিভিন্ন গোষ্ঠীর নর কঙ্কাল আবিষ্কারের পর থেকেই ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ইতিহাসবেত্তৃবন্দ স্থির করেছেন আমরা আজকের যুগে দাঁড়িয়ে বৈদিক যুগ থেকে মানুষের রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র পরিবর্তনের ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করতে গেলে এইভাবে করবো—

(১) বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, গৃহ্যসূত্র ও লোকমাজিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত ঔপনিষদিক যুগ।

(২) তারপর যেটি দ্বিতীয় যুগ সেটি মৌর্য সাম্রাজ্যের যুগ পর্যন্ত। এর অবসান হতে না হতেই পুষ্যমিত্রের রাজত্ব কাল থেকে অন্ধ্র রাজত্ব পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিক্রিয়াশালী তৃতীয় যুগ।

(৩) এই তৃতীয় যুগেরও অবসান হতে না হতেই কুষাণ আধিপত্যের যুগ।

(৪) চতুর্থ যুগের অভ্যুত্থান এবং বৌদ্ধ প্রাধান্যের পুনরভ্যুত্থানের সময়।

(৫) পঞ্চম যুগের সূচনা গুপ্ত সাম্রাজ্যের এবং যে সময়টিকে আজকের ব্রাহ্মণ-পুরোহিত তান্ত্রিক মত সমর্থক ইতিহাসবিদগণ বলেন স্বর্ণযুগ। যদিও এ সময়টায় পুরোহিত তন্ত্রবাদের মাধ্যমেই জাতীয়তাবাদের জন্ম হয় বলে অনেকের অভিমত।

এই পঞ্চম যুগটি ভারতে এমন ভাবে জন্ম নিয়েছে যে, এস্থলে মাৎস্যন্যায়ের জন্ম হয়। আর উত্তরে বৌদ্ধ শ্রীহর্ষের সাম্রাজ্য এবং দক্ষিণে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় পুলকেশীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠার অবসান হয়, এবং উত্তর ভারত খণ্ডীভূত হয়, আর দক্ষিণ ভারতেও ভাগ্যবিপর্যয় হয়। এর পর এমন একটি সময় দীর্ঘ আয়ু নিয়ে জন্ম নেয়, যার নাম ভারতের অন্ধকার যুগ, যে যুগে তুর্কী মুসলমানগণ ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ

করেন, এটাকে ষষ্ঠ যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়।

এই ষষ্ঠ যুগের ভারত সঙ্কর যুগের ভারত এবং সঙ্কট যুগের স্থায়ী প্রতিষ্ঠার জের টেনে চলার ভারত।

অতএব বৈদিক যুগের সমাজ খুঁজতে গেলে বেদে উদ্ধৃত সূক্তিগুলিই আমাদের ভরসা। তিনটি বেদের (চতুর্থ অথর্ববেদের সময়টায় প্রাক্ আর্যদের ভাষা অনেক এসে গিয়েছে) সূক্তি দেখলে এখনকার সংস্কৃত ভাষায় সে সব সূক্তির অর্থ ঢের পাল্‌টে গিয়েছে। কিছু উদাহরণ দিই—

কৃষি—লোক সমূহ—কৃষ্টি—কৃষকের দল (ঋক ২।২।১০ এবং ৪।৮।১০ সূক্ত। 'গ্রাম'—রাত্রি যাপন করবার বসতিস্থল, (অনেকে মিলে) সকালে চলে যাওয়া—(ঋক্ ১০।১২৭।৫)

বাস্তোষ্পতি (ঋক্ ৭।৫৪) এর অর্থ ছিল ঘর তৈরী করতে মাঝের খুঁটি। পরে হলো গৃহদেবতা সূত্রের যুগে)। ঋকের এই সব সূক্তের অর্থ আবিষ্কার করেছেন যাস্ক। এ সম্পর্কে এত বেশী উদাহরণ দেওয়া যায় যে সেটা হবে আর একটা নিরুক্ত বা বৈদিক কোষ।

এবার আরও কতকগুলি দিকের চিত্র তুলে ধরি, যেগুলির দ্বারা জানা যায় বৈদিক সভ্যতার দ্বিতীয় স্তরটি কেমন ছিল। প্রথম স্তরটি খুব শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজের চিত্র ফোটে না, বরং হানাহানির ছবিই বেশী ফোটে। প্রথম হানাহানি, দস্যুদের সঙ্গে (প্রাক্ আর্যদিকে দস্যু বলা হয়েছে পরে ওরা দাস এবং অনার্য, অথবা প্রাক্ আর্য বলে চিহ্নিত হন।)

যাঁরা প্রথম আর্য বা আর্যভাষী তাঁরা বিভিন্ন কুলে বিভক্ত হয়ে (আর্য বা যাযাবর, কারণ ঋ-গতৌ অর্থের শব্দরূপ আর্য) এবং প্রয়োজন হলে আত্মরক্ষার জন্য কিংবা অপর কুলের মধ্যে প্রবেশ করে লুণ্ঠনের জন্য সাময়িকভাবে সংঘবদ্ধ হতেন, আবার পৃথক পৃথক কুলে নিজেদিকে আবদ্ধ করতেন। এটা পাওয়া যায় ঋকের সূক্তে।

সেই কুলই ছিল আর্যদের প্রথম একতার স্থান, তারপর সেই কুলের মধ্য থেকেই কতকগুলি 'বিশ' গঠিত হত, এই দ্বিতীয় পর্যায়ে, সেই বিশগুলি আবার বিভক্ত হয়ে 'জন' সংজ্ঞা লাভ করতো, আধুনিক কালের ইংরাজি ভাষায় জন বোঝাতে পণ্ডিততরা 'ট্রাইব' শব্দ ব্যবহার করেন।

অতএব বিশ এবং জন পৃথক। মাঝে আর একটি গোষ্ঠীরও অস্তিত্ব দেখা যায় কোন কোন সূক্তে তাদের সংজ্ঞা 'গ্রাম'। এখানে গ্রামের অর্থ পরিবার।

আরও পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ যখন বিশগুলি সংহত হয়েছে তখন তাদের মধ্য থেকেই 'রাজন্' শব্দের নিবেশ অর্থাৎ তখন রাজ পদ গঠিত হয়েছে, এটা পাওয়া যায় ঋকের ১০।১২।৪৮ সূক্তে।

রাজাকে বলি বা উপঢৌকন দেওয়ার প্রসঙ্গ দেখা যায় তার পরবর্তী সূক্তে। এই সূক্তগুলি পর পর এমন ভাবে সাজান রয়েছে যে, সে সময় যারা উপঢৌকন নিয়ে রাজার সমীপে আসতেন, তাঁদের কথা এবং রাজার প্রশংসার কথা গান করছেন এক এক গোষ্ঠীর মুখপাত্র যেমন, বশিষ্ঠ-গোষ্ঠী, বিশ্বামিত্র-গোষ্ঠী।

এইসব মুখপাত্রদের জীবিকা নির্বাহ হতো রাজাদেরই দানে। এইসব স্তুতি গায়কদের বলা হতো 'কুলপ'। পরে সেই কুলপগণই কুলপতি নামে বিবর্তিত হয়েছেন।

পরিষ্কার বোঝা যায় অর্থনীতিক কারণগুলি যত মার্জিত হয়েছে সামাজিক পরিবেশও

সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র গঠনে তত ঘনিষ্ঠ হয়েছে।

ঋকের ৭ম থেকে ১০ মণ্ডলের সূক্তিগুলির দ্বারা আমরা জানতে পারি 'স্তি' নামে একটি শব্দের প্রবেশ ঘটছে, যাস্ক, ক্ষীর স্বামী দুর্গাচার্য, মহীধর, উবট প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ 'স্তি' শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেন 'সম্পৎ'। তাই ৭।১৯।১১ সূক্তে স্তুতি গায়কের সম্পত্তি ভাগ করে দেওয়ার কথা, 'স্তি' কে রক্ষার জন্য রাজনকে রক্ষা কর্তা বলে উল্লেখ। সেই 'স্তি' শব্দটি পরের সূক্তিতে উপস্তি আরও পরে 'সম্পৎ' হয়েছে।

তারপর ১০।৬৯।৪ সূক্ত থেকে জানা যায় আর্যগণ অন্যান্য জনদের প্রতি এমনভাবে ব্যবহার করছেন যাতে মনে করা যায় অন্যান্য জন অর্ধস্বাধীন হয়ে আছেন। তাদের সঙ্গে পাশা খেলছেন, সে খেলায় অর্ধস্বাধীন জনবৃন্দ হেরে গেলে নিজের বাড়ি হারাচ্ছেন নিজের স্বাধীনতা হারাচ্ছেন।

আরও চমৎকার বর্ণনা ১০।৩৪।৪ সূক্তটিতে দেখা যায় সেই অর্ধস্বাধীন জনের স্ত্রীকে কোন আর্য আলিঙ্গন করেছেন, কারণ পাশা খেলায় তার স্বামী পরাজিত হয়েছেন, নিজের বাড়ী ঘর হারিয়েছেন।

এই সময় সেই মেয়েটির পিতা মাতা ও ভাই বলছেন আমরা ওকে চিনি না, আর সঙ্গে সঙ্গে অর্ধ স্বাধীন সেই জনের মাতা, পিতা, ভ্রাতাও ওই কথা বলছেন।

এই সূক্তটি আমাদের মহাভারতের পাণ্ডব ও কৌরবদের পাশাখেলার ঐতিহ্যবার্তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কি জানি হতেও বা পারে না কেন? কারণ প্রকৃত তথ্য আজও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ আবিষ্কার করতে পারেন নাই। কাহিনী ছাড়া যখন কিছুই পাওয়া যায় না।

বৈদিক সভ্যতার বিবর্তন প্রসঙ্গ এত বিশাল হয়ে পড়ে যে, একজন সুদীর্ঘ শত বৎসরের সুস্থ আয়ু নিয়ে লিখলেও অমন কত শত পুরুষের প্রয়োজন হবে সে অন্তও হবে সুদীর্ঘ। কারণ ঋকের পরে যজু তারপর অথর্ব। দেখা যায় এক এক বেদের প্রচুর শাখা, প্রতিটি শাখার বিভিন্ন সূক্তে সমাজের অজস্র চিত্র।

আমরা এই ঋকের ১০ মণ্ডলের সূক্তগুলির মধ্যে কয়েকটি মাত্র আলোচনা করে এইটুকু মনে করতে পারি যে, অর্থনীতিক বিবর্তন যত হয়েছে সমাজের রূপও তত পাল্‌টেছে।

এবার আর একটি বিষয়ে দৃষ্টি দিই, সেটা আছে ১০।১০ এবং ১০।১০।৩ এর মধ্যে, তাছাড়া ১০।৩৩।২ সূক্তে এসে ও প্রসঙ্গ সমাপ্ত হয়েছে

প্রসঙ্গটি এই যে, এখন যে আমাদের মনে প্রসঙ্গ ওঠে—আচ্ছা। আর্যরা বিবাহ ব্যাপারে কি করতেন? একই রক্তের পুত্র কন্যাদের মধ্যেই কি আদান প্রদান হতো? অর্থাৎ ভাই বোনের মধ্যেই কি বিবাহ হতো?

এমন প্রশ্ন ভারতীয়দের মনে উঠেছিল কিনা জানিনা, তবে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরাই এমন সন্দেহের ধারার প্রথম আমদানি কারক, তাঁদের নজির হলো প্রাচীন ইরান, মিশরের রাজবংশ ও দক্ষিণ আমেরিকার পেরু প্রদেশের 'ইঙ্কাদের' মধ্যে সহোদর সহোদরার বিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল, আর আলেকজাণ্ডারের পারস্য, মিশর বিজয়ের পর যখন তার সেনাপতি টলেমি এবং সেলিউকাস পারস্য ও মিশরের রাজা হলেন তখন সহোদর ও সহোদরার মধ্যে বিবাহ প্রথা নিজেদের বংশে

প্রচলিত করলেন। এঁরাই নজির দেখিয়েছেন ভারতে ঋক বেদে যম যমী (সহোদর ও সহোদরা) ছিলেন ভ্রাতা ও ভগ্নী, তাঁরাই আবার পতি পত্নী হয়ে যান।

তাঁদের এই ধারণার জন্য ভারতীয় 'দশরথ জাতক' এবং স্কন্দ পুরাণের প্রভাস খণ্ড এবং নাগর খণ্ড ও কম দামী নয়। দশরথ জাতকে গোঁজামিলের নমুনা এইভাবে—

ছুতমণ্ডতি পুরণমিহমেকে…এই বলে পালি ভাষায় আরম্ভ করা হয়েছে 'বহুকাল থেকে আমরা শুনে আসছি পণ্ডিত রাম ও লক্ষ্মণ এবং সীতা ছিলেন এক গর্ভজাত পুত্র কন্যা। রাম রাজা হলে পর সীতাকে বিবাহ করেন।

তাছাড়া জাতকে বলা হয়েছে যে শাক্যনামধারী ক্ষত্রিয়দের মধ্যে সহোদর সহোদরার বিবাহ পবিত্র বিধি।

এছাড়া স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে ভরদ্বাজ ঋষির ঔরসে এবং তদীয় সহোদরার গর্ভে পিপ্পলাদ ঋষির জন্ম কাহিনীটিও ওই মতবাদ প্রচারের জন্য দায়ী। আর মহাভারতে তো বলাই আছে বৃহস্পতি তাঁর ভ্রাতৃবধূর (উতথ্যের পত্নী) গর্ভে এক পুত্রের জন্ম দিয়েই তাঁকে ভরদ্বাজ (অর্থাৎ দু-বাপের ব্যাটা) ঋষিতে প্রখ্যাত করেছিলেন।

কিন্তু ঋকের (১০।১০ এবং ১০।১০।৩) সূক্তে যম যমীর যে কু ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে তাতে কিন্তু স্পষ্টত বলা হয়েছে 'যম তাঁর ভগ্নী যমীকে বলছেন আমি তোমাকে কখনও বিবাহ করিব না, সহোদরাকে বিবাহ করিলে পাপবিদ্ধ হইতে হইবে। এবং বরুণ দেবের নিকট তাহা অজ্ঞাত থাকিবে না।'

ঐ দুটি সূক্তে যমীও বলছেন 'আমাদের পক্ষে এই সংসর্গ নিষিদ্ধ' দস্যুগণও নিন্দা করে'

অতএব এইসব সূক্তের ব্যাখ্যার মন্তব্যে যদি বলা হয়ে থাকে যে অমন প্রথার প্রচলন না থাকলে ভগ্নী হয়ে বা ভ্রাতা হয়ে কি করে সে প্রসঙ্গ টানতে পারে?

কিন্তু ১।১১৮-১০ সূক্তে যেমন আর্যদের বধূগ্রহণের বাধা ছিল না, তেমনি ১০।৩০।২ সূক্তে এক পত্নী মাননীয় দম্পতির একটা ভাল দৃষ্টান্ত ছিল। সেক্ষেত্রে সহোদরা বিবাহ সম্ভবই নয়।

তবে এটা ঠিক যে, ঋক্ বেদের সময়ে (৪ম মণ্ডলের ৬১ সূক্তে) একমাত্র দস্যুকন্যা (দাস পরে শূদ্র) দের সঙ্গে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য (বিশ) পুরুষদের বিবাহ হতো না। বাকী ক্ষেত্রে বর্ণ ছিল কিন্তু জাতি নামে কোন সত্তার অস্তিত্ব ছিল না। আর ছিলনা শৌক্রিক হিসাবেই বর্ণ নির্ধারণ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ের এবং বৈশ্যের স্বভাব কর্মের প্রবণতার দ্বারাই বর্ণ নিরূপিত হতো শৌক্রিক ক্রমে নয়।

এই পদ্ধতিটি যজুর্বেদের আমল আসার আগেই ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়। আর অথর্ববেদের আমল যখন, তখন তো শ্রেণীস্বার্থ পুরোপুরিই প্রতিষ্ঠিত। তাই ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণের লড়াই তখন চরমে উঠেছে, অথর্ববেদের ৪।১৮।১ ব্রাহ্মণাতী জোতটিই ভাল নজির 'হে নৃপতি! দেবতারা এই গাভীটিকে তোমাকে আহার করতে দেয় নাই। ব্রাহ্মণের গরুভক্ষণ করতে চেয়ো না।' এইভাবে শ্রেণীসম্পদ রক্ষার জন্য অন্ততঃ ১০।১২টি সূক্ত।

যজুর্বেদের প্রথম দিকটাতেও কর্ম প্রবৃত্তির দ্বারাই বর্ণবিধানের উল্লেখ। কিন্তু আরও পরে

একেবারে কায়েমী স্বার্থের ব্যবস্থা।

এ সম্পর্কে যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতার (মাধ্যন্দিন শাখা) ৩০ অধ্যায়ের সূক্তগুলি দেখলেই পরিষ্কার ধারণা করা যায় এই অধ্যায়টি ব্রাহ্মণগণের একবিশেষ যাগের প্রসঙ্গেই সূক্তগুলি রচিত হয়েছে, এখানে বলা হয়েছে ঐ বিরাট যাগের জন্য নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণ যে দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থান করবেন, সে সময়ে তাঁদের আনন্দ বিধানের কি ব্যবস্থা? অর্থাৎ অবসর বিনোদন করবেন কি উপায়ে? তাই তারা বললেন এখানে নাচ, গান, ধর্মসভা, মল্লক্রীড়া, হাসির বৈঠক, প্রমোদ আপ্যায়ন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হোক—

'সূত্রায় সূতং, গীতায় শৈলূষং, ধর্মায় সভাচরং নর্মায় রেভং হসায় কারিকং আনন্দায় স্ত্রীসখং, প্রমদে কুমারীপুত্রম'

অর্থাৎ যাঁরা নাচবেন তাঁরা সূত পুত্র, গানের জন্য শৈলূষ অর্থাৎ নট, ধর্মালোচনার জন্য সভাবর, নর্ম আলাপের জন্য রেভ অর্থাৎ একেবারে মাইকে আওয়াজের মত উচ্চকণ্ঠে যারা বক্তৃতা করেন এবং হাসিঠাট্টা করবার জন্য যারা ভাঁড় শ্রেণী আমোদ জন্য যারা সমাজে যুবক যুবতী বন্ধুর মত থাকে, আর প্রমোদ দেবার জন্য যাঁরা কুমারী পুত্র বা কালীন অর্থাৎ অবিবাহিতার গর্ভজাত পুত্র। ইত্যাদির দ্বারা বোঝা যাচ্ছে সমাজে তখন বর্ণ-অপেক্ষা শৌক্রিক বংশে জাত হয়ে বংশগত পেশা পেয়ে গিয়েছেন। মহীধর ভাষ্য করেছেন নৃত্যের জন্য যে সূতকে নিযুক্ত করা হয়েছে, তাদের সূত সংজ্ঞাটি ব্রাহ্মণীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসজাত সন্তান। পরে এইটাই মনুকথিত 'সূতজাতি'।

এর পরের সূক্তগুলিতেও দেখা যায় যে যজুর্বেদীয় সমাজে তখন জাতির অস্তিত্ব দেখা দিয়েছে এবং উপপতি, জ্যেষ্ঠা থাকতে কনিষ্ঠের বিবাহ ঘটেছে (ওদিকে পরিবিত্ত বলা হতো) বড় মেয়ে থাকতে ছোট মেয়ের বিবাহ হয়েছে, (ওদিকে পরিবিবিদ বলা হতো)?

এই জন্যই বর্তমান পণ্ডিতগণের দৃঢ় যুক্তি অর্থনীতিক বাতাবরণ যেমন যেমন পরিবেশ সৃষ্টি করে সভ্যতার উত্তরণ অবতরণও তার সঙ্গে এগিয়ে পিছিয়ে চলে এবং মানব সভ্যতার সাংস্কৃতিক-রূপও এক অপরকে সন্দেহ সংশয় পদে নিমজ্জিত করে আবার তাকেই অবলম্বন করে আর এক প্রকারে উজ্জীবিত হয়। এ যুক্তির দ্বারা বেদের সূক্তিরাজির প্রতি বিচার প্রতিমোক্ষটি চলাচল দৃষ্টির মাধ্যমেই প্রকাশ পেয়ে থাকে।

আ লো চ না

ভারত-ইরাণ

পাশাপাশি দুটি দেশ ইরাণ ও ভারত। সংস্কৃতিতে সুপ্রাচীন। মানবাদর্শে ও কৃষ্টিতে পরস্পর যুক্ত। প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সুদূরকাল থেকে নগর বসতিতে গ্রামীণ বসতিতে প্রত্ন-সৌধে বেশভূষায়, শিল্পদ্রব্যে অনেক দেওয়া নেওয়ায় দুটি দেশই সমৃদ্ধতর হয়েছে। পারসীক অর্থাৎ 'পার্স-শক', 'পহ্লব', 'শাকদ্বীপী প্রভৃতি নানা নামেও অভিধায় তারা ভারতীয় সমাজে আপনাদের উপস্থিতিকে প্রমাণিত করেছে।

ভারতের বৈদিক পূর্ব ও বৈদিক কৃষ্টিতে এই আদান-প্রদানের কথা সুপরিচিত। বৈদিক সমাজের মত ইরাণীয় সমাজেও পবিত্র অগ্নি সংরক্ষণকারী পুরোহিত শ্রেণী 'অথর্বন', যোদ্ধবর্গ 'রথেষ্ঠা', 'বাস্তরিয়' বা বৈশ্য শ্রেণী, 'হুইতি' বা স্রব্য উৎপন্নকারীদের নিয়ে গঠিত। ইন্দো-ইরাণীয় ভাষার ভারতীয় ও ইরাণীয় শাখার নৈকট্যও আমাদের অজানা নয়।

কুরুষ, দরবহুষ, ক্ষয়ার্শ, অর্দেশির, বহরাম, হরমুজদ তথা হখামনিষীয়, পার্থব, সাসানীয় বহু রাজার রাজত্বকালে ভারতীয় উপ-মহাদেশের উত্তর এবং পশ্চিমে সাংস্কৃতিক ধ্বনি প্রতিধ্বনির আদান প্রদান ও প্রভাব অনুভব করা গেছে যুগে যুগান্তরে।

প্রাচীন ভারতের মৌর্যকালীন ও মৌর্য পরবর্তী শিল্পকলায়, ক্ষুদ্রালঙ্কারে, নগর সন্নিবেশে ভাস্কর্যে ও স্থাপত্যে কৃষ্টিগত ভাববিনিময় চিরকাল থেকেছে অব্যাহত। ইরাণ একাধিক ক্ষেত্রে সংস্কৃতির প্রভাব বিতরণ করেছে তার অকীয় ও অকৃত্রিম ভাণ্ডার থেকে। আবার বহু ক্ষেত্রে ইরাণের সাহায্যে ও ইরাণের মাধ্যমে সমগ্র পশ্চিম এশিয়া এবং গ্রীক রোমক কৃষ্টির প্রভাব এসেছে ভারতের মাটিতে!

সাসানীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর জরথুস্ত্রবাদী ইরাণীয়দের একটি অংশ ভারতের দিকে আশ্রয়লাভের জন্য উত্তরে খোরাসান থেকে ইরাণের দক্ষিণের উপসাগরীয় এলাকায় হরমুজ হয়ে গুজরাটের উপকূলে এসেছিলেন। ঠিক কখন এরা এসেছিলেন সেটি নির্দিষ্টরূপে জানা না গেলেও অনুমান করা হয় ঘটনাটি খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকের। ষোড়শ শতকে নওসারি'র পার্শী পুরোহিত বেহমান কায়কোবাদ সনজনা কর্তৃক রচিত পুস্তিকাটি ভারতের মধ্যে বসবাসকারী ইরাণীয়দের বা আজকের দিনের 'পার্শী' নামে পরিচিত জনগোষ্ঠীর ইতিহাসের দিক থেকে মূল্যবান। 'অদি রাণা' নামে পরিচিত যে রাজার আশ্রয়ে পার্শীরা ভারতে এসেছিলেন তাঁকে অনেকে অনহিলওয়াড়া পত্তন এর বনরাজ চাভ্‌দা বা মতান্তরে শিলহর বংশীয় বজ্জদেব বা পশ্চিম চালুক্যবংশীয় বিজয়াদিত্য রূপে উল্লেখ করেছেন। 'কিস্‌সা-ই-সনজন' জানাচ্ছে যে পার্শীরা তাঁদের ধর্মীয় মত স্থানীয় শাসন কর্তাকে জানিয়েছিলেন, গুজরাটকে নিজেদের ভাবাঙ্গরূপে গ্রহণ করেছিলেন। এবং তাঁদের সমাজের মহিলারা

ভারতীয় বেশভূষা গ্রহণ করেছিলেন। সনজন থেকে কয়েক শতকের মধ্যে পার্শীরা ক্যাম্বে, বম্বাসের, ব্রোচ, আঙ্কলেশ্বর, নবসারি প্রভৃতি কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়েন। পার্শী-নামে ও উপাধিতে ক্রমে গুজরাটের বিভিন্ন স্থানের নাম যুক্ত হয় ভবনগরী, বালসরা, রাজকোটওয়ালা, সনজনা, থাম্বাট্টা, আঙ্কলেশরিয়া প্রভৃতি ও প্রকারের নিদর্শন। ত্রয়োদশের শেষ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে পার্শীরা গুজরাটে মুসলিম আক্রমণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ষোড়শ শতকের সপ্তমদশকে দস্তুর মেহেরজি রাণা আকবরের ধর্মালোচনা সভায় জরথুস্ত্রীয় মতবাদ প্রকাশিত করার জন্য আমন্ত্রিত হন এবং ক্রমে পার্শী সমাজের মুখ্য পুরোহিত রূপে গণ্য হন। সপ্তদশও অষ্টাদশ শতকে মধ্যবর্তীরূপে মুঘল সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র ও বন্দর সুরাটে পার্শীদের আধিপত্য দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে রুস্তম মানোক ও তাঁর পুত্র নওরোজি রুস্তম মানোক উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে প্রথম জন একই সঙ্গে গোয়ার পর্তুগীজ শাসনকর্তার রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করেছেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যবর্তী প্রতিনিধির কাজ করেছেন, সুরাটের নবাব ও আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন। দ্বিতীয় জন ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে আবেদন নিবেদন করার জন্য ইংলণ্ডে উপস্থিত হয়েছেন।

সপ্তদশ শতকে শেষ থেকে সুরাটের ক্রমান্বয়ে অবনতির পর থেকে বোম্বাইয়ে এসেছেন ব্রিটিশ শাসকদের উৎসাহে এবং তাদের দেওয়া 'মালাবার হিলে'র একাংশে বসতি করেছেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের আবর্তে বোম্বাই পার্শীদের প্রধানতম কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৮২২ থেকে ১৮৪৬ এর মধ্যে 'বোম্বাই সমাচার' 'মুম্বাই বর্তমান', 'জাম-ই জামসেদ', মুম্বাইনা চাচুক' 'সমাচার দর্পণ', 'চিৎরনজন্ দর্পণ' প্রভৃতি মুখ্য পার্শী-গুজরাটি সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পার্শীদের কর্মপ্রয়াস যথেষ্ট প্রভাব সঞ্চার করেছিল। ১৮৫৯-তে এসেছে দাদাভাই নৌরজী প্রতিষ্ঠিত 'রাস্ত্ গোফ্তার' এবং পার্শী সমাজের মধ্যে সামাজিক সংস্কার আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছে। পরে অবশ্যই এই পত্রের কাজ ছিল গোঁড়ামতবাদের সমর্থক। ১৮৮২তে ফ্রামজী কাওয়াসজী মেহতা'র দ্বারা প্রকাশিত 'কাইজর-ই হিন্দ' গুজরাটি ভাষার মাধ্যমে জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থক পত্রিকারূপে প্রতিভাত হয়েছে।

উনবিংশ শতকের ভারতের ইতিহাসে ব. ম. মালাবারী'র 'ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটর' বিশেষ প্রভাবশালী ছিল। এরপরে এসেছে ফিরোজশাহ মেহতা প্রতিষ্ঠিত, 'বোম্বে ক্রনিকল'। 'কাইজর-ই হিন্দ' ছাড়া সমস্ত পত্রিকাই ব্রিটিশ শাসনের সমর্থক ছিল।

এর কারণও ছিল একাধিক। বোম্বাই থেকে ইউরোপ ও ভারতের মধ্যে প্রায় সমস্ত বাণিজ্য পার্শীদের দ্বারা সাধিত হত। যদিও সরাসরি বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল একচেটিয়াভাবে ব্রিটিশ কোম্পানীদের করায়ত্ত। কিন্তু পূর্ব এশিয়ায় আফিমের ব্যবসায়ে ব্রিটিশ পার্শীদের হাতে নিষিদ্ধ আফিমরপ্তানীর কাজটা ছেড়ে দিয়ে আড়ালে লাভ করতে থাকে এবং কয়েকটি পার্শী পরিবার ইউরোপীয় কায়েদের পরিচালনায় জন্য জাহাজ রেখে বিরাট অর্থ জমিয়ে তোলে। পার্শীদের পরে খোজা ব্যবসায়ী ও ইহুদিরা এই কাজটি করতে থাকে। বোম্বাই-এ জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রের স্থাপনের পরে ব্রিটিশ সংযোগিতায় ওয়াদিয়া পরিবার ব্রিটিশ নৌবাহিনী ও বাণিজ্যের জন্য প্রায় তিনশতটি সমুদ্রগামী জাহাজ গড়ে তোলে। এই সমস্ত পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় মূলধন থেকেই পার্শী ব্যবসায়ীরা

ব্যাঙ্ক, যন্ত্রশিল্প, বস্ত্রশিল্প, বিদ্যুত উৎপাদন প্রভৃতিতে ক্রমশঃ অগ্রগতি লাভ করে এবং পরে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ও বৃহৎ রাসায়নিক শিল্পে এবং আধুনিক যন্ত্রায়নে মুখ্য অংশ নেয়।

ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পার্শীদের অবস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রথমদিকে এঁরা উপরিলিখিত নানা কারণে ব্রিটিশ সমর্থক সংস্কারমূলক রাজনৈতিক কাজকর্মের উপর জোর দেন। 'স্যর' কাওয়াস্জী জাহাঙ্গীর কর্তৃক ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের রিজেন্ট পার্কে স্থাপিত একটি স্মৃতিসৌধের উৎকীর্ণ লিপিতে এটি সরাসরি ফুটে উঠেছে। এতে বলা হচ্ছে যে এটি ব্রিটিশ শাসনের দ্বারা সুরক্ষার জন্য পার্শীদের দ্বারা ব্রিটিশ জাতির প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শনরূপে এটি উৎসর্গীকৃত। ১৮৫৭-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্যের প্রস্তাব গ্রহণকারী 'পার্শী পঞ্চায়েত' এর কাজকর্মের এই মনোভাবই প্রকাশিত হয়েছিল। এইভাবে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময়েও ব্রিটিশকে সমর্থন জানায় পার্শী সমাজের প্রধানরা।

কিন্তু পার্শীদের মাধ্যমেই আধুনিকতার আবহাওয়া ভারতে গড়ে ওঠে। মালাবারি'র প্রচেষ্টাতেই ব্রিটিশ আমলে 'এজ অব কন্সেন্ট বিল' পরিণতি লাভ করেছিল। 'এস এস বেঙ্গলী'র প্রচেষ্টায় (১৮৭৮ থেকে) ১৮৮১র 'ইণ্ডিয়ান ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট' এবং ১৮৯১-র ইণ্ডিয়ান ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট' গৃহীত হয়। বি পি ওয়াদিয়া ১৯১৮-তে মাদ্রাজে শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলেন। ওয়াদিয়া জাতীয় মুক্তিতে ভারতীয় শ্রমিকদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এই প্রসঙ্গে এস্ এইচ ঝাবুভালা, এবং এস ভি সাকলাতওয়ালাও স্মরণ করার মত কাজ করে গেছেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মাদাম ভিকাজী কামা ও দাদাচান্জী কেরসাস্প্ এ দুইজনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখার যোগ্য। মাদাম কামা তাঁর সুদীর্ঘকাল য়ুরোপে অবস্থানের সময়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র অভিযানের কার্যকলাপে তাঁর সমগ্র শক্তি ব্যয় করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তীব্র বিদ্বেষের সঙ্গে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে তাঁকে দেশে দেশে অতিষ্ঠ করবার চেষ্টা করে কিন্তু তিনি তাঁর অদম্য কর্মক্ষমতার দ্বারা 'তলোয়ার ও বন্দেমাতরম' পত্রিকা ছুটির সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতার বাণী দেশে বিদেশে ছড়িয়ে দেন ও প্রবাসী ভারতীয় স্বাধীনতাযোদ্ধাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করতে থাকেন। দাদাচান্জী সিন্ধু প্রদেশ থেকে বোম্বাইয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথমে উত্তর আমেরিকার 'আইওয়া'তে ও পরে জার্মাণীতে গমন করেন। গদর দল এঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। জার্মাণীতে তিনি বিস্ফোরক নির্মাণেও শস্ত্র ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করেন। কেরসাস্প পশ্চিম এশিয়ার তুরস্কের পথে ইরাণের ও আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারত সীমান্তে উপস্থিত হন। পরে ব্রিটিশ পদলেহনকারীদের কাপুরুষোচিত আক্রমণে তিনি গুলীবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। ভারতীয় জাতীয়তার ক্ষেত্রে তরুণ ও প্রাণোচ্ছল কেরসাস্প চিরপ্রণম্য।

ভারতের ইতিহাসে পার্শী সমাজের একটি বিশেষ স্থান আছে। এক এক সময়ে বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক কারণে প্রধানতঃ ইংরেজ ঘেঁসা রীতিনীতি অনুসরণ করলেও ভারতের পার্শী সমাজ কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায়, আধুনিকতায় স্বদেশপ্রেমে ও আন্তর্জাতিক ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে দেশের কৃষ্টিকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছেন।

সংখ্যার দিক থেকে অপেক্ষাকৃত কম হলেও ভারতে পার্শী সমাজের প্রভাব ও অর্থনৈতিক ও

সামাজিক ভূমিকা কোনমতেই অবহেলার যোগ্য নয়। জাগতিক ব্যাপারে পার্শীদের উৎসাহ তাঁদের জাতীয় জীবনকে মূল্যবান করে তুলেছে। পার্শীসমাজ তার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপে পিছনদিকে মুখফেরানো পুরোহিতকুলের একাধিপত্যকে সফলভাবে সীমিত করে এবং জাতীয় মনোভাবের বিকাশের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত ও সাধারণ মানুষের দিকে থেকে একাধিকবার অর্থকৌলিন্যকে অস্বীকার করে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছে।

উপরিউক্ত কারণসমূহের জন্য পার্শী তথা জরথুস্ত্রীয় জীবনাদর্শ, ভারতীয় পার্শী সমাজের আশা আকাঙ্ক্ষা, আচার ব্যবহার রীতিনীতি এসব ভারতের সুবৃহৎ জনসঙ্গমে আলোচিত হবার যোগ্য।

বাংলায় পার্শী সমাজের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য রচনার বা গ্রন্থের একান্ত অভাব আছে। অথচ এই সমাজের কাজকর্ম ও অবদানকে আমরা কোনক্রমেই ভুলে যেতে পারি না। একেহার্ড কুল্‌কে রচিত 'দ্য পার্শীজ ইন্ ইণ্ডিয়া ; এ মাইনরিটি অ্যাজ এজেন্ট অব্ সোস্যাল চেনজ্' (বিকাশ, দিল্লী, ১৯৭৪) এবং ডঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপ্রয়াস' (ফার্মা কে, এল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতায়, ১৯৬২) নামক বই দুটি হাতে আসবার পর পার্শীসমাজের কথা বিশেষ ভাবে বর্তমান লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পার্শী সমাজের ন্যায় আমাদের ভারতের এই রকম যে সব সমাজ আছে তাদের যদি একটি একটি তথ্য-নিষ্ঠ আলোচনা করা যায় তাহলে উত্তম হয়। বাংলাকে আমরা নানাদিক থেকে সর্বদিকে সচেতন প্রগতিশীল ভাবনা চিন্তার বাহন বলে সন্তুষ্ট হয়ে থাকি। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষিত আলোচনা না হলে আমাদের মাতৃভাষার যথার্থ উন্নতি হতে পারে না।

বৃহত্তর ইরাণীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির সম্যক পরিচয়লাভের জন্য আমাদের আরও সচেষ্ট হওয়া উচিত বলেই মনে হয়। আমাদের দেশের ভাবে ভাবনায় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইরাণ তার গভীর ছাপ ফেলেছে। পার্শী-সমাজ ইরাণের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের একটি সজীব যোগসূত্র রচনা করে দিয়েছে। ভারতীয় মাটিতে ইরাণের মানবাদর্শ ভারতকে কতটা দিয়েছে আর কতটা ভারত থেকে গ্রহণ করেছে তার আলোচনা অবশ্যই মনোগ্রাহী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে।

মিহিরচন্দ্র মিত্র

সমালোচনা

জমিদার রবীন্দ্রনাথ ॥ অমিতাভ চৌধুরী। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। মূল্য ৭'০০ টাকা।

'কবির জীবন মানুষের কী কাজে লাগিবে? তাহাতে স্থায়ী পদার্থ কী আছে? কবির নামের সঙ্গে বাঁধিয়া তাহাকে উচ্চে টাঙ্গাইয়া রাখিলে ক্ষুদ্রকে মহতের সিংহাসনে বসাইয়া লজ্জিত করা হয়। জীবনচরিত মহাপুরুষের এবং কাব্য মহাকবির।' টেনিসনের জীবনীগ্রন্থ হাতে নিয়ে একসময় রবীন্দ্রনাথ এই উক্তি করেছিলেন। বস্তুত ঐ জীবনকথা কোন মহান্ কর্মব্রতীর কর্মকাণ্ডের ধারাবিবরণী নয়। অন্যদিকে রবীন্দ্রকবি স্বয়ং ছিলেন আজীবন কর্মমুখর, সহৃদয় সামাজিক। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আদর্শ, নিষ্ঠা ও সহৃদয়তার মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। সজ্ঞানে বাস্তবে পা রেখে তিনি উত্তরণে পাড়ি জমিয়েছেন, নিজের জীবন তাঁর কাছে যেন নিরীক্ষা ও চর্চার বিষয়। তাই এই পূর্ণ সূর্যের উষা ও সন্ধ্যার মাঝে সংঘটিত অতি তুচ্ছ সমাচারেও আমাদের আগ্রহের অন্ত নেই। ইতিপূর্বে বহু সূত্রে শিলাইদহ, সাজাদপুর এবং পতিসরে রবীন্দ্রনাথের বৈষয়িক ক্রিয়াকলাপের কিছু কিছু সমাচার আমরা জ্ঞাত হয়েছি। বলাবাহুল্য, সেই উপাদান থেকে জমিদার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পরম্পরা বজায় রেখে কোন স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তোলা সহজসাধ্য ছিল না। বর্তমান লেখককে ধন্যবাদ শতবর্ষের সূর্যপূজার বারোয়ারী উদ্যমে যা সম্ভব হয়নি তিনি নৈষ্ঠিক শ্রমে তা করেছেন।

'যিনি অক্সফোর্ডে রিলিজন অফ্ ম্যান নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন, তিনিই পদ্মার চরে আলু চাষে মগ্ন হয়েছেন। যিনি হিজলি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছেন, তিনিই কুষ্টিয়ায় আখের কল খুলেছেন। যিনি বার্ণার্ড শ রম্যাঁ রল্যাঁর সঙ্গে নিভৃত আলোচনা করেছেন সত্যসুন্দর নিয়ে, তিনিই কফিলুদ্দিন আহমেদ বা জালালুদ্দিন শেখের সঙ্গে ধান খেতে পোকা মারার পদ্ধতি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করেছেন।··· এই অনন্য চরিত্র নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে তাই আমার বার বার মনে হয়েছে—কবি নয়, সংগীতজ্ঞ নয়, দার্শনিক নয়, যেন একজন হৃদয়বান কর্মযোগী হওয়ার জন্যেই রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আর সাহিত্য-সংগীত ইত্যাদি জমিদারি পরিচালনার ফাঁকে উপজাত সৃষ্টি।'

লেখকের শেষ ছত্রের ঐ 'উপজাত সৃষ্টি'র সঙ্গে একমত হওয়া না গেলেও বলা যায় মহৎ মানুষ রবীন্দ্রনাথকে জানতে হলে তাঁর বৈষয়িক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পরিচয় থাকা বিশেষ প্রয়োজন। লেখক বহু শ্রম স্বীকার করে জমিদার রবীন্দ্রনাথের চেহারা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন এবং উপাদান সংগ্রহের অসুবিধার কথা ও প্রাসঙ্গিক সূত্রের কথা বলেছেন। কিন্তু মনে হল কিছু কিছু উপাদান তিনি হয়ত অবহেলা করেছেন। যেমন সুধাকান্ত রায়চৌধুরীর কোন কোন রচনা এই প্রসঙ্গে আলোকপাত করতো বলে ধারণা হয়। অমিতাভবাবু বলেছেন, কিছু বাঙালী বিশ্বাস করেন এবং সাড়ম্বরে প্রচার করেন যে রবীন্দ্রনাথ নাকি জমিদার হিসাবে অত্যাচারী ছিলেন। এই সূত্রে পতিসরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে থেকে

সুধাকান্তবাবু লিখেছে, 'ফেরার পথে, যতদূর স্মরণ হয়, রেল-ষ্টেশনের অনতিদূরে রবীন্দ্রনাথের বোটের কাছে এসে ভিড়ল রাজশাহী জেলার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নৌকা। ঐ নৌকা থেকে বেরিয়ে এসে কবির বোটে উঠলেন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এ এস রায়, আই-সি-এস, কেতা-দোরস্ত সাহেবী পোষাক।... আরম্ভ হল দুজনে আলাপ-আলোচনা।...আলোচনা প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথকে বললেন, তিনি ঠাকুর ষ্টেটের বিরুদ্ধে পূর্বে যেসব কথা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে আসার আগে শুনেছিলেন সে সব কথার বিরুদ্ধ প্রমাণই পাচ্ছেন এ জেলায় এসে।...ঠাকুর ষ্টেট প্রজাদের হিতার্থে অনেক কিছু করেছেন একথা ঠাকুর ষ্টেটের প্রজাদের কয়েকজনের কাছেই শোনা' (রবীন্দ্রনাথ ও গ্রাম)।

সুদৃশ্য প্রচ্ছদ, সুমুদ্রিত ও কয়েকটি মূল্যবান চিত্রসম্বলিত এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে যোগ্য সমাদর লাভ করবে। গ্রন্থ প্রকাশের সার্থকতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্র কবির ভাষায় বলা যেতে পারে, 'কোনো ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে এবং জীবনের কর্মে, উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন—কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল।' এই ক্ষণজন্মা ব্যক্তির লোকোত্তর প্রতিভার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে অমিতাভ চৌধুরীর 'জমিদার রবীন্দ্রনাথ' একটি সার্থক প্রয়াস।

পক্ষধর ভট্টাচার্য